ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

www.nagorikpathagar.org

ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ প্রফেসর মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌র এদেশের রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয়ের ওপর অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধের সংকলন। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর ছাত্রজীবনের দুটি লেখাসহ অতি সাম্প্রতিক কালের লেখা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ, জাতীয়তাবাদী রাজনীতির দর্শন ও বর্তমান বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ইসলামী আন্দোলনসহ, প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে প্রফেসর মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌ কত সাচ্ছন্দ ও সাবলীলতার সংগে, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচরণ করতে পারেন, এই গ্রন্থটি তারই এক অনুপম নিদর্শন। রাজনীতি যাঁদের জীবিকা নয় কিন্তু আদর্শ, যাঁরা দেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত তাঁদের সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করে অনেক প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবেন।

প্রচ্ছদ : ফরিদী নুমান
গ্রাফিক্স : ডিজিটাল ক্যানভাস

www.nagorikpathagar.org

মাহবুব উল্লাহ্। জন্ম ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৫, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জের তিতাহাজরা গ্রামে। বৈচিত্রময় বর্ণাঢ্য জীবনের মানুষ। কর্মজীবন সক্রিয় রাজনীতি থেকে অধ্যাপনা ও গবেষণা পর্যন্ত বিস্তৃত। '৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানের বিপ্লবী নেতা। ১৯৭০ এর ২২ শে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে 'স্বাধীন জন-গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা'র কর্মসূচী উত্থাপনের অপরাধে ইয়াহিয়ার সামরিক আদালতে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে দীর্ঘ ২২ মাস কারান্তরালে অন্তরীণ থাকার পর ১৯৭১ এর ১৭ই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মোহম্মদ তোয়াহা, কমরেড আবদুল হক, কমরেড সুখেন্দু দস্তিদার, কমরেড দেবেন সিকদারের সংগে কাজ করেছেন। ১৯৭২ সনে পুনর্গঠিত মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। ছাত্রজীবন থেকেই ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রে লেখালেখি করে আসছেন। জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনার আর্থ-সামাজিক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ভিত্তি নির্মাণ তাঁর সাম্প্রতিক লেখালেখির মূল উপজীব্য। ১৯৭৬ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। বর্তমানে ঐ বিভাগের প্রফেসর। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। অর্থনীতিতে পি.এইচ.ডি ডিগ্রীর অধিকারী প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করেছেন।

এছাড়া তিনি কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার, ডেনমার্কের সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ, নেপালের ইন্টারন্যাশনাল মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট ও বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ইউনিভার্সিটির সংগে গবেষণা কাজ করেছেন। তাঁর অন্যতম গবেষণা গ্রন্থ Land Livelihood and Change in Rural Bangladesh ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (UPL) থেকে প্রকাশিত হয়েছে ও গবেষক মহলে সমাদৃত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি
ও
অন্যান্য প্রসঙ্গ

মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মাহ্বুব উল্লাহ্

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকাল ঃ একুশে বইমেলা ২০০১

প্রকাশক ❑ মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম জ্ঞান বিতরণী ৩৮/২খ বাংলাবাজার (তাজমহল মার্কেট) ঢাকা-১১০০ স্বত্ব ❑ লেখক কম্পিউটার ❑ বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মুদ্রণ ❑ শালুক প্রিন্টার্স প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য ❑ ১০০ টাকা

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

উৎসর্গ

মজলুম প্রফেসর আফতাব আহমাদ
অনুজ প্রতিমেষু

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

নিবেদন

'ষাটের দশকের ছাত্র রাজনীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' একটি সংকলন গ্রন্থ। এ বছরের একুশে উপলক্ষে এটি পাঠকের কাছে পেশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই সংকলনে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলো ১৯৬৬ থেকে ২০০০ সনের বিভিন্ন সময়ে সাপ্তাহিক বিচিত্রা, অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক গণবাংলা, সাপ্তাহিক রোববার, সাপ্তাহিক পূর্ণিমা, সাপ্তাহিক হলিডে (এই গ্রন্থে বাংলা তরজমায়), দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ ও ষাটের দশকের বিভিন্ন একুশে সংকলন ও লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য অনুধাবন করেই এগুলোকে একটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হলো। সময়াভাবে প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার নাম সংযোজন করতে না পারায় দুঃখিত। পাঠকের কাছে সমাদৃত হলে পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো যোগ করার ইচ্ছা রাখি। সময়ের বিবর্তনে আমার চিন্তাভাবনায় পরিবর্তন ঘটেছে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু একটি মৌলিক অঙ্গীকারের প্রতি আমি অবিচল থাকতে চেয়েছি–তা হলো প্রিয় স্বদেশ ভূমির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও জনগণের আর্থ-সামাজিক মুক্তি। আশা করি গ্রন্থটি সচেতন পাঠকদের কৌতুহল কিঞ্চিত হলেও মেটাতে সক্ষম হবে।

সবশেষে 'জ্ঞান বিতরণী'কে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

মাহ্‌বুব উল্লাহ্
ঢাকা
১.০২.২০০১ ইং

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি ◆ ১১
জানুয়ারি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ◆ ৪২
সংস্কৃতি ও শ্রেণী সংগ্রাম ◆ ৪৬
শিক্ষার দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ ◆ ৫০
রাজনীতি-শিল্প : গণ-অভ্যুত্থান ◆ ৫৪
সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যাবলি ◆ ৫৯
পুরোগামী জননেতা ◆ ৭৫
শতাব্দীর অনন্য প্রতিভা চৌ-এন লাই ◆ ৮২
রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ ◆ ৮৬
অধ্যাপক আবু মাহমুদকে যেমন দেখেছি ◆ ৯০
বাংলাদেশে : জাতি-রাষ্ট্র গঠনের সংকট ◆ ৯৯
বংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ও সম্ভাবনা ◆ ১০৪
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকটে করণীয় ◆ ১১১
বাংলাদেশে প্রশাসনের জবাবদিহিতা : কতিপয় প্রসঙ্গ ◆ ১১৬
ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উৎস ◆ ১২৪
ইসলামী আন্দোলনের স্বরূপ বিচার ◆ ১২৯
বাংলাদেশী মন ও মানসিকতা ◆ ১৩৩

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি

সমকালীন সময়ের ইতিহাস বিধৃত করা এক বিরাট সমস্যা। রজনী পাম দত্ত তাঁর প্রবলেমস্ অব কনটেমপরারি হিস্ট্রি (Problems of Contemporary History) গ্রন্থে এ সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। সুতরাং আমাদের পক্ষে ষাটের দশকের রাজনীতি নিয়ে আলোচনার অবতারণা করা সত্যি এক দুঃসাহসিক ঝুঁকির ব্যাপার। কারণ বাংলাদেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল এই সময় কালে আমি নিজেও খানিকটা সচেতনভাবে এতিহাসিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। সুতরাং এই আলোচনা আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ হতে পারে না।

দুই

'৬২-এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সামরিক শাসনের ধাক্কা সামলে ছাত্র ইউনিয়ন তখনো সুসংগঠিত হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু সর্বত্রই সাংগঠনিক কাঠামো ছিল। সংগঠনের এই ন্যূনতম রূপটি বজায় থাকার পেছনে কমিউনিস্ট পার্টির গোপন তৎপরতা সহায়তা করেছে। এই প্রয়াস শুধুমাত্র সংগঠনের কাঠামোটিকে কোনোক্রমে টিকিয়ে রাখার মধ্যেই সীমিত ছিল। সামরিক শাসনের বেড়াজাল সত্ত্বেও ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক তৎপরতা চালাত। ছাত্র ইউনিয়নকে পরিচালনা করার ব্যাপারে মাঝে মাঝে পার্টি নেতৃত্ব ও ছাত্র নেতাদের মধ্যে বিরোধ বাঁধত। এই সংক্রান্ত কিছু কিছু কাহিনী তৎকালীন ছাত্র নেতাদের কাছে থেকে আমরা শুনতে পেয়েছি। আন্দোলনের প্রশ্নে পার্টি নেতৃত্বের সব সময়েই একটা জড়তা ও স্থবিরতা লক্ষ করা যেত। সামরিক শাসনামলের প্রতিশ্রুতিবান ছাত্র নেতা আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, সামরিক আইন লঙ্ঘিত হবে এই আশঙ্কায় পার্টি নেতারা হল সংসদ নির্বাচনেও অংশ গ্রহণে মত দিতেন না। এতৎসত্ত্বেও পার্টির নির্দেশকে উপেক্ষা করে ছাত্র-ইউনিয়নের সমর্থকেরা নির্বাচন করেছেন। '৬০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল শহীদদের মাজার থেকে শহীদ মিনার পর্যন্ত মৌনমিছিল করা। আনোয়ার জাহিদ বলেছেন, সেই মিছিলে তিনি যখন একটি রাজনৈতিক শ্লোগান তুললেন তখন গোটা মিছিলটাই শ্লোগানে শ্লোগানে সরব একটি রাজনৈতিক বিক্ষোভ মিছিলে পরিণত হল। শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত নিষেধের বেড়াজাল খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে নতুন এক ট্র্যাডিশন গড়ে উঠেছে। আর তা হল অগণতান্ত্রিক

www.nagorikpathagar.org

নিষেধাজ্ঞার ফলে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর আর কোনো পথ যখন থাকে না তখনি ২১শে ফেব্রুয়ারি হয় বরফ ভাঙার উপলক্ষ। গণবিরোধী কিংবা গণমুখী সকল শক্তিই এই দিবসটিকে নিজ নিজ রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিলের কাজে ব্যবহার করে। এখানে বলে রাখা দরকার পার্টি নেতৃত্ব অবশ্য পরবর্তীকালে আনোয়ার জাহিদের এই বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতাকে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং নিজেদের ভুল মূল্যায়নের সমালোচনা করেছিলেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, '৬২-এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের প্রক্রিয়া সামরিক শাসনের চরম বিভীষিকাময় দিনগুলোতেই শুরু হয়েছিল। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর গ্রেপ্তার ছিল উপলক্ষ মাত্র। সোহ্‌রাওয়ার্দীর মার্কিন ঘেঁষা প্রবণতা সত্ত্বেও ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা মনে করতেন তার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠবে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের দাবি, রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি ও গণতন্ত্রের দাবি। প্রাসাদের ষড়যন্ত্র রাজপথে ছাত্র জনতার বিক্ষোভে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। সত্যিই তাই হয়েছিল। কেবলমাত্র শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মুক্তির দাবিই আন্দোলনের মূল স্লোগান হয়ে থাকল না। এই স্লোগানকে ছাপিয়ে যেসব শ্লোগান বুলন্দ হয়ে উঠল, সেসব হল সামরিক আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দির মুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামরিক শাসনের কালো দিনগুলোতে তৎকালীন পাকিস্তানের বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর যে নির্মম নির্যাতন হয়েছিল তার কাহিনী প্রকাশ পেল। একে একে প্রকাশ পেল লাহোর দুর্গের নির্জন প্রকোষ্ঠে তৎকালীন পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হাসান নাসিরের হত্যা কাহিনী, বেলুচিস্তানে সামরিক বাহিনীর নির্মম নিপীড়নের লোমহর্ষক কাহিনী, মোমেনশাহীর কৃষকনেতা কাজী আব্দুল বারী কী করে সামরিক আইনের বেত্রদণ্ডের ফলে শ্রবণ শক্তি হারিয়েছিলেন ও কৃষকনেতা নগেন সরকারের দীর্ঘ কারাজীবনের কাহিনী। এ ছাড়াও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত শত বীর যোদ্ধাদের অসংখ্য আত্মত্যাগ ও নিপীড়ন নির্যাতন ভোগের কাহিনী জনসমক্ষে প্রকাশ পায়। নীরবে, নিভৃতে গণতন্ত্রের সাচ্চা সৈনিকেরা দেশ, জাতি ও জনগণের মুক্তির কামনায় যে অত্যাচার সয়েছিলেন সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেইসব বীরগাথা লোক লোকালয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

'৬২-এর ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের পর স্কুল-কলেজ কিছু দিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলে আন্দোলনে একটা স্তিমিতভাব নেমে আসে। ছাত্র-নেতারা বিশেষ করে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র লীগ এই দুই সংগঠনের নেতৃত্ব যারা গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে ছিলেন আপসহীন তাঁরা বুঝে উঠতে পারলেন না কী করে গণতন্ত্রের এ আন্দোলনকে এগিয়ে নেবেন? শাসকগোষ্ঠী সেই সুযোগ করে দিলেন। '৬১ সাল থেকেই আইয়ুবের শিক্ষা কমিশনের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছিল। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনারেল আইয়ুব খানের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন এই কমিশনের চেয়ারম্যান। শিক্ষা কমিশনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল–'শিক্ষা হল একটি পণ্য। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যেমন বাজারদরে পণ্য বিকিকিনি হয় শিক্ষার বাজারেও শিক্ষা নামক পণ্যকে ক্রয় করতে হবে।' শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের এই পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ ছাত্র সমাজের বোধগম্য না হলেও রিপোর্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ছাত্র সমাজকে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। এসব পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিল তিন বছরের ডিগ্রি পাসকোর্স চালু, এইচ এস সি ক্লাসে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত বোঝা, প্রতি বছর ফাইন্যাল পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি। যেহেতু সমস্যাগুলো ছিল মূলত কলেজ ছাত্রদের, সেহেতু কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে এইসব সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠে। ছাত্ররা একে তোঘলকি শিক্ষা বলে আখ্যায়িত করে। ঢাকা কলেজ থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ডিগ্রির ছাত্ররাই প্রথমে আন্দোলন শুরু করেন। ঢাকা কলেজে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জনৈক এন. আই. চৌধুরী। তিনি ডিগ্রির ছাত্র ছিলেন এবং 'মনের বীণায়' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এর পাশাপাশি এইচ এস সির ছাত্ররাও সভা ও বিবৃতি প্রদান করতে শুরু করেন। জুলাই মাস থেকে কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে নিয়ে ছাত্র অসন্তোষের সূচনা হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে আন্দোলনের সূচনা লগ্নে ডিগ্রী ও উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের তেমন কোনো সমন্বয় ছিল না। আন্দোলনের ঢেউ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা এসে ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্নাতক ছাত্ররা লাগাতার ধর্মঘট শুরু করলেন। উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্ররা ইংরেজির ক্লাস বর্জন করলেন। এই সময়ে ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কাজী ফারুক আহমদ। কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। তিনি ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন–এক পর্যায়ে তিনিও কলেজ ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং এই আন্দোলনকে একটা সংগঠিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ১০ই আগস্ট (১৯৬২) বিকেল বেলায় ঢাকা কলেজ কেন্টিনে এক ছাত্র-সভা অনুষ্ঠিত হল। এই সভায় ডিগ্রি ও এইচ এস সির ছাত্ররা সম্মিলিতভাবে যোগদান করে। তিনি ছাত্রদের বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে বললেন শিক্ষার আন্দোলন ও গণতন্ত্রের আন্দোলন একসূত্রে গাঁথা। সুতরাং এই আন্দোলনে গণতন্ত্রের দাবি ও শিক্ষার দাবিকে সন্নিবেশিত করতে হবে। ছাত্ররা তাঁর আহ্বানে অনুকূল সাড়া দিল। ১০ই আগস্টের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ১৫ই আগস্ট দেশব্যাপী সাধারণ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হবে। বস্তুত এই সভার পূর্বে শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠনগুলোর তেমন কোনো যোগাযোগ ছিল না। কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতারা তখন মনে করতেন শিক্ষা সংক্রান্ত দাবি দাওয়ার প্রশ্নে বিরাট ও ব্যাপক আন্দোলন হওয়ার সম্ভাবনা কম। আমি পূর্বেই বলেছি এই

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ঢাকা কলেজ থেকে। তখন এই কলেজের কয়েকজন ছাত্র এই আন্দোলনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। এদের মধ্যে জনাব নুরুল ইসলাম (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি), জনাব সুলতান মাহমুদ্ খান, জনাব আবদুর রশীদ, জনাব আহ্সান আলী ও জনাব শাহ্ সালাউদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রথমদিকে যখন আন্দোলনের প্রশ্নটি নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, কেন্দ্রীয় নেতারা অনেকটা অনীহার সঙ্গে আন্দোলনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সম্মত হলেন।

১৫ই আগস্ট দেশব্যাপী সফল ছাত্র ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে শিক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন পরবর্তী বৃহৎ কর্মসূচি ছিল ১০ই সেপ্টেম্বর সেক্রেটারিয়েটের সামনে অবস্থান ধর্মঘট। ১৫ই আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় বেশ কয়েকটি ছাত্রসভা ও সেখান থেকে বেশ কয়েকটি বিক্ষোভ মিছিলও বের হয়। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এসব বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। ১৪৪ ধারা জারি করার ফলে ১০ই সেপ্টেম্বর অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়। ১৪৪ ধারা জারি করতে গিয়ে সরকারি প্রেসনোটে হুমকি দেওয়া হল 'যদি কেউ এই নির্দেশ ভঙ্গ করে সেক্রেটারিয়েট ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের চেষ্টা করে তা হলে তার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হবে।' অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হলেও ১৭ই সেপ্টেম্বর সারা পূর্ব-পাকিস্তানে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। হরতালের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় ছাত্র-জনসভা ও সভাশেষে বিক্ষোভ মিছিল। ১০ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজধানীতে ছোট ছোট স্কোয়াড মিটিং, পথসভা ও খণ্ড মিছিলের আয়োজন করে হরতালের সপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা হল। এ ছাড়া বিভিন্ন কর্মচারী সমিতি, ব্যবসায়ী সমিতি, রিকশা ইউনিয়ন ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। সর্বত্র হরতালের সমর্থনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল। ১৭ই সেপ্টেম্বর কাকডাকা ভোর হতে ঢাকা নগরী মিছিলের নগরীতে পরিণত হল। দোকান-পাট, অফিস-আদালত, যানবাহন সব বন্ধ, রাস্তায় রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষের মিছিল। সকাল ৯টায় ঢাকা কলেজ থেকে আমরা একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় গিয়ে হাজির হলাম। আমতলায় এত লোকের সমাবেশ হল যে সভার নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। রাজপথের বিক্ষোভ মিছিলে মেহনতি মানুষের সংখ্যাই ছিল শতকরা ৯৫ জন। এমনকি বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে নৌকার মাঝিরা বৈঠা হাতে মিছিল নিয়ে আসে। জনসমাগম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় সভা বাতিল করা হল। মিছিল শুরু হল। মিছিলের সঙ্গে কার্জন হলের সামনে আসতেই দেখলাম মোনেম-এর মন্ত্রীসভার সদস্য হাসান আসকারীর মার্সিডিজটি চাকা উল্টে পড়ে আছে ও আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে। এর পাশেই আরেকটি পুলিশের জিপও আগুনে জ্বলছিল। মিছিল আবদুল

www.nagorikpathagar.org

গনি রোডের মোড়ে আসতেই পুলিশ গুলি চালাল। কে একজন পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আহত ব্যক্তিকে ছাত্ররা ধরাধরি করে কার্জন হলের চত্বরে নিয়ে এল। কিছুক্ষণ বিরতির পর আহত ব্যক্তির রক্তমাখা শার্ট নিয়ে শুরু হল জঙ্গী মিছিল। একই দিনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হলেন ওয়াজীউল্লাহ্ ও বাবুল। ১৭ই সেপ্টেম্বরের অপর একটি বৈশিষ্ট্য একজন সচেতন রাজনৈতিক কর্মীও পুলিশের গুলিতে আহত হন। তিনি ছিলেন ন্যাপ কর্মী আবদুস সামাদ। সাধারণ কেরানিগিরির কাজ করতেন তিনি। গুলিবিদ্ধ হয়ে তাঁর হাতে প্রচণ্ড জখম হয়। দীর্ঘদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা সত্ত্বেও তাঁর হাতটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে নি। এই পঙ্গু হাত নিয়ে তিনি আজো বেঁচে আছেন।

ঢাকায় বিক্ষোভ ও হরতালকে কেন্দ্র করে রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব সেনাবাহিনীর ওপর অর্পণ করা হল। তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন জনাব গোলাম ফারুক। ১৮ই সেপ্টেম্বর সকাল ৮ টায় সলিমুল্লাহ্ হলের শহীদ পার্কে শহীদদের জন্য গায়েবানা জানাজা ও মোনাজাত করা হল। উল্লেখ্য যে, এই জানাজায় বালুচ নেতা খায়ের বকস্ মারী ও গাউস বক্স বেজেঞ্জো শরীক হন। নামাজের পর দুজন দুজন করে পাঁচ হাতের ব্যবধানে লাইন করে এক বিরাট শোক-মিছিল বের হয়। পুলিশ কিংবা ই পি আর এই শোক-মিছিলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে নি।

শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন করাচির কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন। ১৭ই সেপ্টেম্বরের গণ-অভ্যুত্থানকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় সেই ব্যাপার নিয়ে তিনি নিজস্ব উদ্যোগে গভর্নর গোলাম ফারুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আইয়ুব খানও পাকিস্তানে ছিলেন না। প্রেসিডেন্ট দ্যগলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য প্যারিস গিয়েছিলেন। আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের এই পরিস্থিতি নিয়ে তার মারফত ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। শোনা যায়, গভর্নর ফারুক গুলি চালাতে রাজি না হলেও আইয়ুব খানের নির্দেশে পুলিশ ও ই পি আর জনতার বিক্ষোভ মিছিলের ওপর গুলি চালায়, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে '৬২-এর গণ-অভ্যুত্থানে ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টিতে ছাত্র ইউনিয়ন ছিল কমিউনিস্ট পন্থী সংগঠন। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব নিজেও ছিলেন একজন দক্ষিণপন্থী নেতা। তিনি গভর্নর গোলাম ফারুককে বোঝালেন সহিষ্ণুতার সঙ্গে ছাত্রদের দাবি দাওয়াগুলো বিবেচনা করা না হলে আন্দোলন আরো হিংসাত্মক রূপ ধারণ করতে পারে এবং এতে করে কমিউনিস্টরাই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করবে। সুতরাং ছাত্রদেরকে একটা আশ্বাস দিয়ে আন্দোলন থামাবার ব্যবস্থা করা দরকার। এদিকে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব ছাত্রলীগ নেতাদের বোঝাতে সমর্থ হলেন যে আর বাড়াবাড়ি করলে তাতে ছাত্র ইউনিয়নই লাভবান হবে অর্থাৎ কমিউনিস্টরাই লাভবান হবে। সুতরাং একটা সমঝোতায় আসা উচিত। সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেবের

www.nagorikpathagar.org

পরামর্শে সরকার সায় দিলেন। অভ্যুত্থানের তৃতীয় দিনের মধ্যে সরকারের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত রাখা হবে। '৫২ ভাষা আন্দোলনের পর তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে বৃহত্তর গণ-অভ্যুত্থান এভাবেই আপষের পথে স্তিমিত হয়ে এল।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে '৬২-এর আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক কাজী জাফর আহমদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আবদুর রহিম আজাদ, যুগ্মসম্পাদক হায়দর আকবর খান রণো ও প্রচার সম্পাদক রাশেদ খান মেনন প্রমুখ অত্যন্ত জনপ্রিয় ছাত্রনেতা হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা। বক্তৃতায় কাজী জাফরের জুড়ি তখনকার আমলে ছিল না। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে তাঁর বাগ্মীতাই তৎকালে বহু ছাত্রছাত্রীকে ছাত্র ইউনিয়নে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি যখন আইয়ুবের নির্যাতন নিপীড়নের কাহিনী বলতেন তখন অনেককে চোখের জলও ফেলতে দেখেছি। এতই মর্মস্পর্শী ছিল তাঁর বক্তৃতা। আজ-কাল যারা তাঁর বক্তৃতা শোনেন তাঁরা ভাবতেই পারবেন না '৬২তে কাজী জাফর এত ভালো বক্তা ছিলেন। আসলে ইতিহাসের কয়েকটি যুগে একেক জন ব্যক্তি বিশেষ এমন একটি ভূমিকা পালন করেন যার মাধ্যমে ইতিহাস একটা নতুন দিকে মোড় নেয়। '৬২তে কাজী জাফর ছিলেন সেই মানুষ। এই প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন বর্তমানে ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ও মরহুম শেখ ফজলুল হক মণি-এঁরা দুজনেই ছিলেন ভালো বক্তা। এঁদের বক্তৃতায় গণতন্ত্র ও সাধারণ রাজনৈতিক অধিকারের দাবিই প্রাধান্য পেত। অপরদিকে কাজী জাফরদের বক্তৃতায় অর্থনৈতিক সঙ্কট, গণতন্ত্রের সমস্যা ও বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর আইয়ুবি স্বৈরাচারের নির্যাতন নিপীড়নের কাহিনী প্রাধান্য পেত। '৬২-এর আন্দোলনে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনও অংশগ্রহণ করে। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করতেন জনাব আবুল হাসনাত (বর্তমানে ব্যারিস্টার)। ছাত্র-শক্তির একটি অংশও এ আন্দোলনকে সমর্থন করে। খুব সম্ভবত মিয়া মোহাম্মদ নুরুজ্জামান (জনাব ওয়াহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিয়ার আত্মীয়) এঁদের প্রতিনিধিত্ব করতেন। '৬২-এর আন্দোলনে শেখ মুজিবের তেমন কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না। শেখ মুজিব তখন একটি অবাঙালি বীমা কোম্পানিতে চাকরি করতেন। জিন্নাহ্ এভিন্যুতে এর পূর্ব-পাকিস্তানস্থ সদরদপ্তর ছিল। ছাত্রদের বড় বড় মিছিলগুলো যখন জিন্নাহ্ এভিন্যুর ঐ পথ অতিক্রম করত শেখ মুজিব তখন বাতায়ন পথে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের বাহ্বা দিতেন।

অতীতে এদেশের শাসকগোষ্ঠী যখনই কোনো আন্দোলন হত তখনই এর পেছনে কমিউনিস্টদের কারসাজি আবিষ্কার করত। কিন্তু '৬২-এর ঘটনাপঞ্জি আমার যতদূর মনে আছে এর পেছনে কমিউনিস্টদের অদৃশ্য হস্ত আবিষ্কার করা হবে এক হাস্যকর

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপার। শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে এতবড় একটি গণ-অভ্যুত্থান হতে পারে তা আন্ডার গ্রাউন্ড কমিউনিস্টরা মোটেও আঁচ করতে পারেন নি। আন্দোলন যখন তুঙ্গে পৌছল তখন হয়তো কমিউনিস্ট মহল এই আন্দোলনের প্রতি কিছুটা উৎসাহ দেখিয়ে থাকতে পারেন। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব সংশোধনবাদীদের করায়ত্ত ছিল। এরা দক্ষিণপন্থী আওয়ামী লীগকে নাখোশ করে কোনো পদক্ষেপ ফেলতে চাইতেন না। এর প্রমাণ মেলে সোহ্‌রাওয়ার্দী সাহেব যখন '৬২-এর গণ-অভ্যুত্থানকে আপসের চোরাগলিতে ঠেলে দিলেন, এরা তখন আন্দোলনকে ধরে রাখার জন্য তেমন কিছু করলেন না। প্রশ্ন উঠতে পারে আন্দোলনকে ধরে রাখার মতো তাদের সংগঠনও ছিল কিনা। অনেক নেতাই ছিলেন তখন জেলে। কিন্তু তাঁরা কী অজুহাতে সোহ্‌রাওয়ার্দীর আপসের ভাঁওতাকে উন্মোচিত করলেন না তা মোটেও বোধগম্য নয়। আসলে এই আন্দোলন ছাত্রদের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবেই শুরু হয়েছিল। ছাত্ররা তাদের দৈনন্দিন শিক্ষা সমস্যা থেকেই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং এ থেকেই আন্দোলনের জন্ম। সুতরাং এতে ছিল না কোনো কমিউনিস্টদের কারসাজি কিংবা জাতীয় নেতারা কেউ একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চান নি। বরং তাঁদের কেউ কেউ আগ বাড়িয়ে বাধা দিতে চেয়েছেন। সুতরাং পূর্ব-বাংলার ছাত্র ইউনিয়ন সম্পর্কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে বিষোদ্‌গারটি করতেন তা আদপেই সত্য নয় অর্থাৎ ছাত্ররা কখনোই রাজনীতিকদের দাবাখেলার ঘুঁটি ছিলেন না।

তিন

'৬৩-এর হল-সংসদ ও ডাকসুর নির্বাচনে ছাত্র ইউনিয়ন ৯৩টি আসনের মধ্যে ৮০টি আসন দখল করল। অবশ্য কোনো কোনো হল ইউনিয়ন নির্বাচনে এপসু ছাত্রলীগের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠন করেছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দলীয় প্রচারণার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনগুলো তখন গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলত। হল সংসদ নির্বাচনে প্লাটফর্ম প্রচারের আয়োজন করা হত। বিভিন্ন প্লাটফর্ম থেকে বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা সুদীর্ঘ প্লাটফর্ম বক্তৃতা দিতেন। এসব বক্তৃতা এক নাগাড়ে পাঁচ-ছয় ঘণ্টা চলত—জাতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়াদি থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি কিছুই বাদ যেত না। দলীয় নেতারা বাংলাতেই বক্তৃতা দিতেন। হল শাখার নেতা ও নির্বাচন প্রার্থীর ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। যে সংগঠনের প্রার্থীরা ইংরেজিতে ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন তারা উচ্চতর মেধার অধিকারী বলে পরিচিত হতেন। পরিচয়পত্রও ছাপান হত ইংরেজিতে। পরিচয়পত্রের প্রথম অধ্যায়ে সংগঠনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তব্য সন্নিবেশিত হত। আমি তখনকার সময়ে ছাত্র রাজনীতিতে পরমত সহিষ্ণুতার কথা বলেছি। কিন্তু এটা ছিল পূর্ব-বাংলার ছাত্র আন্দোলনে খুবই ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। এর আগের বছরও সলিমুল্লাহ্‌ হলে এন এস এফ ছাত্র ইউনিয়নের ওপর চড়াও হওয়ার

www.nagorikpathagar.org

জন্যে জার্মানির রাইখ স্টাগ ঘটনার মতো একটি অজুহাত সৃষ্টি করেছিল। সলিমুল্লাহ্ হল অডিটোরিয়ামে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র একটি প্রতিকৃতি ঝোলান থাকত। কে বা কারা এর কাচের আচ্ছাদনটি ভেঙে দেয়। এন-এস-এফ এই ঘটনার জন্য ছাত্র ইউনিয়নকে দায়ী করে। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ও এন এস এফের মধ্যে মারামারি বেধে যায়। ছাত্র ইউনিয়নের বক্তব্য ছিল এটা এন এস এফ-এর একটি সাজান ব্যাপার। যাহোক পরবর্তীতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এন এস এফ পন্থীরা মাতম ধ্বনির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র প্রতিকৃতি যথাস্থানে স্থাপন করে। এই ঘটনা থেকে এন এস এফ-এর খুদে ফ্যাসিস্ট চরিত্র ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

চার

১৯৬৩ সালের পর থেকে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে মেরুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ ছিল ছাত্র ইউনিয়নের দ্বিধাবিভক্তি, '৬২-এর ছাত্র ঐক্যে ফাটল, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে ভাঙন, আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি ও ৬ দফাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগে ভাঙন প্রভৃতি। প্রকাশ্য রাজনীতিতে এ ভাঙনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্ডারগ্রাউন্ড কমিউনিস্ট আন্দোলনেও শুরু হয়েছিল ধারাবাহিক ভাঙনের প্রক্রিয়া। বস্তুত '৬৩ থেকে '৭১-এর রাজনীতি হল এই বহুধা বিস্তৃত মেরুকরণ প্রক্রিয়া ও তা থেকে উদ্ভব হয় নতুন রাজনৈতিক শক্তির রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় ভূমিকা।

'৬০ থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে প্রকাশ্য বিতর্কের সূচনা হয়। সেই সময় থেকে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনেও সেই বিতর্কের হাওয়া বইতে শুরু করে। মস্কোতে অনুষ্ঠিত ৮১ পার্টির আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের পার্টির কমরেড নেপাল নাগ প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। দেশে ফিরে তিনি নিজ পার্টির কাছে যা রিপোর্ট করেন তা হল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনের পর ১৭ দিনের বিরতি ঘোষণা করা হল। কেন এই বিরতির প্রয়োজন হল আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। ১৭ দিন পর একটা যৌথ ইশতেহার সম্মেলনে আগত ডেলিগেটদের পড়ে শোনানো হল। এই যৌথ ইশতেহার ৮১ পার্টির দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়।' ৮১ পার্টির দলিলটি ছিল মূলত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিবদমান দলগুলোর মধ্যে একটি আপস ফরমুলা। এতে মস্কো ও পিকিং উভয়েরই মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল। আমাদের দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশেরই আনুগত্য ছিল রুশপার্টির প্রতি। ৮১ পার্টির দলিলে প্রতিফলিত রুশ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি তাঁরা তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেই লাইন প্রয়োগের পক্ষে ওকালতি করেন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে কেবলমাত্র দুজন সদস্য ছিলেন যাঁরা চীনা পার্টির লাইনের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেন এবং পার্টি তাঁদের

www.nagorikpathagar.org

মতামত প্রচারের উদ্দেশ্যে 'আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুই নীতি, নামে, একটি দলিল প্রচার করেন। এই দলিলটি 'খালেদ-বশীরের' দলিল হিসাবে পরিচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পার্টিতে যে মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু হল তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, জাতীয় প্রেক্ষাপট নয়। স্বদেশ ও নিজ জনগণের বিপ্লবের ক্ষেত্রে সঠিক লাইন কী, অতীতের ভুলভ্রান্তি কোথায় এবং সম্ভাবনা থাকা সত্তেও এদেশের বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশ কেন ব্যহত হচ্ছে এই আলোচনা বিতর্কের সূত্রপাতের ক্ষেত্রে স্থান পায় নি। অথচ সংশোধনবাদ ও বিপ্লবের মাঝখানে সবচেয়ে বড় সীমারেখা হল জাতীয় পরিস্থিতিতে কার অবস্থান কোথায়? কে চীনা পার্টিকে সমর্থন করে কে রুশপার্টিকে সমর্থন করে সেটাই বিপ্লবী কিংবা সংশোধনবাদী তা নিরূপণের একমাত্র মাপকাঠি হতে পারে না।

পার্টির অভ্যন্তরে যখন এই ধরনের একটা বিতর্কের সূত্রপাত হয় তখন অনেকটা পার্টি নেতৃত্বের অজান্তে ছাত্র ইউনিয়নে পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিংবা পার্টিমনাদের মধ্যে একটা স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। এই স্নায়ুযুদ্ধের মূল কারণ হল পার্টি নেতৃত্বের আস্থা কে অর্জন করতে পারবেন? এতে একদিকে প্রতিনিধিত্ব করতেন মোহাম্মদ ফরহাদ (বর্তমানে সি পি বির সাধারণ সম্পাদক) অপরদিকে ছিলেন কাজী জাফর আহম্মদ। এঁদের প্রথমজন ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের কোষাধক্ষ্য এবং দ্বিতীয় জন ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক। মোহাম্মদ ফরহাদ তখন আত্মগোপনে থাকতেন আর কাজী জাফর '৬২-এর আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ছাত্রমহলে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছেন। ফরহাদকে পার্টি নেতৃত্ব ছাত্র ইউনিয়নে পার্টি সংগঠনের দায়িত্ব প্রদান করলেন। এটা কাজী জাফর আহ্মদের মনঃপূত হল না। তখনকার দিনে পার্টির আশীর্বাদ না থাকলে, কারুর পক্ষেই গণফ্রন্টে তিনি যতই জনপ্রিয় হোন না কেন তাঁর পক্ষে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব বজায় রাখা সুদূর পরাহত ছিল। সুতরাং কাজী জাফর পার্টি নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারালেন। এবং মোহাম্মদ ফরহাদের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ তীব্র হয়ে উঠল। জনাব ফরহাদ পার্টি নেতৃত্বের সেই অংশেরই আস্থা অর্জন করেছিলেন যাঁরা ছিলেন রুশপন্থী। অপরদিকে জনাব কাজী জাফর খালেদ, বশীরদের কাছে থেকেও সরাসরি কোনো সমর্থন পেলেন না। বিরোধ থাকা সত্ত্বেও খালেদ-বশীররা তখনো ছিলেন পার্টি শৃঙ্খলার মধ্যে। একারণে ছাত্রইউনিয়নের বিরোধে তাঁদের নাক গলানোর কোনো অধিকার ছিল না এবং তাঁরা এ ব্যাপারে নাক গলাতে চান নি। জনাব কাজী জাফর ও জনাব ফরহাদের মধ্যে কার এই বিরোধে কতখানি রাজনীতি ছিল এবং কতখানি ব্যক্তিগত সদ্ভাবের অভাব ছিল তা বিতর্কসাপেক্ষ। ইতিহাস তা নির্ধারণ করবে। '৬২ সালের ছাত্র ইউনিয়নের প্রাদেশিক সম্মেলনে জনাব কাজী জাফর আহম্মদ যে সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন তাতে রাজনৈতিক বিরোধ আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কাজী জাফর আহম্মদ জনাব মোহাম্মদ ফরহাদের সঙ্গে তাঁর কোনো ব্যক্তিগত

www.nagorikpathagar.org

বিরোধ আছে একথা কস্মিনকালেও স্বীকার করেন নি। তিনি সবসময় বিরোধটাকে রাজনৈতিক বিরোধ বলেই প্রচার করতেন। অপর দিকে ছাত্র ইউনিয়নে জনাব মোহাম্মদ ফরহাদের অনুসারীরা এই বিরোধকে নিছক ব্যক্তিগত বলেই উড়িয়ে দিত। তারা কাজী জাফরকে একজন রাজনৈতিক উচ্চাভিলাসী হিসেবে চিত্রিক করার প্রয়াস পেত। কাজী জাফর অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গেই নিজেকে সংশোধনবাদ বিরোধী ক্রুসেডের অগ্রসেনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর বাগ্মীতা তাঁকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় বিরাটভাবে সহায়তা করেছে। তদুপরি ছিল জনাব রাশেদ খান মেনন, জনাব হায়দার আকবর খান রনো, জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া প্রমুখের বলিষ্ঠ সমর্থন। ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব আব্দুল মতিন আলোচ্য সময়কালে কারারুদ্ধ ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সংশোধনবাদী লাইনের প্রতি তিনিও প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। '৬৫ সালের সম্মেলনের পূর্ব মূহূর্তে যখন ছাত্র ইউনিয়নের বিরোধ চরমে পৌঁছে সেইসময় চিকিৎসার জন্য তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থানান্তরিত হন। এই সময় তিনি ছাত্রকর্মীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং সংশোধনবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জনাব আবদুল মতিনের এই অবস্থানও ছাত্র ইউনিয়নে কাজী জাফরের হাতকে শক্তিশালী করে। প্রায় একই সময়ে কাজী জাফরও জেল থেকে ১ মাসের প্যারলে মুক্তি পান। ঐ সময়ে তিনি নিজ সমর্থকদের সংগঠিত করার কাজে সদ্ব্যবহার করেন। এমনি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে '৬৫ সালের প্রথম দিকে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ছাত্র ইউনিয়নের প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্বে কনভোকেশন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতারা অনেকেই ছিলেন কারাগারে। এদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন, ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সভাপতি জনাব এ কে বদরুল হক, সাধারণ সম্পাদক জনাব হায়দর আকবর খান রনো, ডাকসুর সহ-সভাপতি জনাব রাশেদ খান মেনন, জনাব আলী হায়দার, জনাব বদিউজ্জামান বড় লস্কর প্রমুখ। এই সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। সম্মেলনে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব নুরুল রহমানের রিপোর্টকে কেন্দ্র করে বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন নিছক ও প্রচার ও প্রতিবাদমূলক। রিপোর্টের এই বক্তব্য নিয়ে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ছাত্র ইউনিয়নে যারা সংশোধনবাদের বিরোধিতা করতেন তাঁদের মতে এই বক্তব্যের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে খাটো করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃত্বের সংশোধনবাদী অংশ বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রণতরীর পাঁয়তারাকে নিন্দা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন এ ধরনের নিন্দাবাদ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ফাটলের সৃষ্টি করবে। অপরদিকে যাঁরা সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁদের

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন ছিল এক ও অবিভাজ্য। এখানে উল্লেখ্য যে সম্মেলনে ছাত্র ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয় সেই সম্মেলনের প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন অধ্যাপক আবুল ফজল। এই সম্মেলনে আমি ও জনাব মতিয়ুর রহমান (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অধুনালুপ্ত মুখপত্র 'একতা'র সম্পাদক) সেমিনার উপ-কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক ছিলাম। সেমিনারে কারা আলোচনা করবেন এ নিয়েও কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, কবি জসীমউদ্‌দীন, জনাব আহমেদুর রহমান (ভীমরুল), জনাব আলী আকসাদ ও জনাব আনোয়ার জাহিদ। জনাব আলী আকসাদ ছিলেন জনাব মতিয়ুর রহমানের পছন্দসই ব্যক্তি, আমি ব্যক্তিগতভাবে জনাব আনোয়ার জাহিদকে আমন্ত্রণ জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করি। এতে জনাব সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক ও মতিয়ুর রহমানরা খানিকটা ইতস্তত করে সম্মতি দিলেন। জনাব আনোয়ার জাহিদ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ওপর বক্তব্য রাখেন। আনোয়ার জাহিদ তখন 'জনতা' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তখনকার দিনে 'জনতা' ছিল সংশোধনবাদ বিরোধী আদর্শগত সংগ্রামে এক শাণিত হাতিয়ার। এ কারণে 'জনতা' সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ মতিয়ুর রহমানদের অনুরাগের ব্যক্তি ছিলেন না। সম্মেলনের শুরু থেকেই কাউন্সিলার লিস্টের প্রশ্নে ও সম্মেলন কক্ষে প্রবেশের অধিকার নিয়ে ছোটখাটো হাতাহাতি বাধে ও হাতাহাতি চূড়ান্ত সংঘর্ষে পরিণত হয় নির্বাচনী অধিবেশনে। জনাব রাশেদ খান মেনন ও কাজী জাফরের সমর্থকেরা সম্মেলন মঞ্চ দখল করে তাঁদের পছন্দসই প্যানেল পাস করান। অপর দিকে বেগম মতিয়া চৌধুরী ও সাইফুদ্দিন আহমদ মানিকের সমর্থকরা সম্মেলনের শেষদিন রাতের বেলায় তৎকালীন ইকবাল হলের ছাদে তাঁদের প্যানেল পাশ করেন। পরদিন বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় এক বা একাধিক প্যানেলের খবর বের হয়। 'জনতা' পত্রিকা হেডলাইন ছিল 'দ্বিধাবিভক্ত ছাত্র ইউনিয়নে এখন সবাই ঐক্য চায়।' কিন্তু সে ঐক্য আর কখনো হয় নি। মেনন ও মতিয়া গ্রুপ নামে ছাত্র ইউনিয়নের দুটি পৃথক সংগঠন পৃথক সংগঠন পৃথকভাবে কাজ করতে থাকে।

পরবর্তীকালে জাতীয় রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহে এই দুই সংগঠনের পার্থক্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৬৫-এর সেপ্টেম্বর যুদ্ধে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) মাতৃভূমির রক্ষায় আওয়াজ তোলে ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। অপরদিকে মতিয়া গ্রুপ মুখরক্ষার জন্য দেশরক্ষার কথা বললেও তা মূলত শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পাক-ভারত বিরোধ নিস্পত্তির কথা বলেন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) পাকিস্তানের প্রতি গণচীন, আলবেনিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সমর্থনকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানান। মেনন গ্রুপ কাশ্মীরের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রতিও দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অপরদিকে

www.nagorikpathagar.org

মতিয়া গ্রুপ এই প্রশ্নে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই ভূমিকা গ্রহণ করে। কাশ্মীর প্রশ্নে সংশোধনবাদীদের ভূমিকা বরাবরই ভারত ঘেঁষা ছিল। তাদের দৃষ্টিতে ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সুতরাং কাশ্মীর ভারতের অঙ্গীভূত হলে তা হবে কাশ্মীরবাসীদের জন্য মঙ্গলজনক। অপরদিকে পাকিস্তান ছিল তাদের দৃষ্টিতে পশ্চাদগামী সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। সুতরাং কাশ্মীরের পাকিস্তানে যোগদানের প্রশ্নই উঠতে পারে না। অথচ মার্ক্সবাদের এই মৌলিক শিক্ষাকে তারা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন পাকিস্তান ও ভারত উভয়েই বুর্জোয়া সামন্ত রাষ্ট্র। সুতরাং এ দুই-এর মধ্যে গুণগত কোনো পার্থক্য নেই।

পাক-ভারত যুদ্ধের অবসানের পর পরই অনুষ্ঠিত হয় তাসখন্দ সম্মেলন। কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও কে আক্রমণকারী ও কে আক্রান্ত এই প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে আইয়ুব-শাস্ত্রীর মধ্যে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল তাসখন্দ শান্তি চুক্তি। ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপ ও হাভানা সম্মেলন থেকে সদ্য প্রত্যাগত মওলানা ভাসানীও তাসখন্দ চুক্তিকে সমর্থন করলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে জামাতে ইসলামসহ কতিপয় উগ্র ধর্মান্ধ শক্তি তাসখন্দ চুক্তি বিরোধিতা করার নামে চরম দক্ষিণপন্থী ও মার্কিন ঘেঁষা অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছিল। এ কারণে তাসখন্দ প্রশ্নে মওলানা ভাসানীসহ মস্কোপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা একটি বিন্দুতে এসে মিলে গিয়েছিল। যদিও এ প্রশ্নে বামপন্থী মহলে আজো দ্বিমত আছে সেদিনকার সেই ভূমিকা সঠিক ছিল কী না? উল্লেখ্য যে, ত ৎকালীন আবদুল হক ও মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী) ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার আশায় তাসখন্দ ঘোষণাকে সমর্থন করেছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে মওলানা ভাসানী ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে তাঁর সমর্থক অংশ জাতিসংঘ বর্জন করে আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় নিপীড়িত জাতিসমূহের জন্য ভিন্ন জাতিসংঘ গড়ে তোলার দাবি জানায়। তাঁদের বক্তব্য ছিল : মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত জাতিসংঘ কাশ্মীরসহ দুনিয়ার কোনো দেশেরই মুক্তি সংগ্রামের সপক্ষে দাঁড়াতে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদের আস্তানা জাতিসংঘ ত্যাগ করা উচিত। সুকর্ন-এর ইন্দোনেশিয়াও জাতিসংঘ বর্জন করেছিল। চীনা পত্র-পত্রিকায় সে খবর ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। চীন তখন জাতিসংঘের সদস্য ছিল না এবং চীন জাতিসংঘের সদস্য হতে চায় এমন কোনো আভাসও তখন চীনা পত্র-পত্রিকায় পাওয়া যেত না। আমাদের দেশের বামপন্থীরা গণচীনের সেই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সেন্টিমেন্টাল এটাচমেন্ট প্রকাশ করেছিলেন। আমার মনে হয় চীনের পররাষ্ট্রনীতি তখন অতি বামদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। উইলফ্রেড বার্চেট ও চৌ-এন লাই-এর বক্তব্য থেকে এ অভিমতের সপক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) জাতিসংঘ বর্জনের বিপক্ষে বক্তব্য রাখে এবং জাতিসংঘের ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরার

www.nagorikpathagar.org

চেষ্টা করে। পাক-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যেসব আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলো পাকিস্তানের রাজনীতিতে উত্তপ্ত বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল যুদ্ধের দিনগুলো দূরে সরে যেতে যেতে সেগুলো স্তিমিত হয়ে আসে। জাতিসংঘ সংক্রান্ত বিতর্কও এভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। জাতীয় রাজনীতিতে জাতীয় ইস্যুগুলো আবার প্রাধান্যে আসতে থাকে। জাতীয় রাজনীতিতে এই মোড় পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বড় কারণ হল শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচি।

পাঁচ

১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিব লাহোরে বিরোধী দলগুলোর সম্মেলন বর্জন করে এসে ঢাকা বিমানবন্দরে 'বাঙালির মুক্তিসনদ' ৬ দফা পেশ করেন। ৬ দফা পেশ করার পর পরই এই সম্পর্কে নানা রূপ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি তখনো বিভক্ত হয় নি। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা ভাষানী ৬ দফা ডিসমিস করে দিলেন। ছাত্র ইউনিয়ন (মেননগ্রুপ) এই কর্মসূচি জাতির মুক্তি সনদ নয় বলে ঘোষণা করল। অপরদিকে মতিয়া গ্রুপ একে অসম্পূর্ণ কর্মসূচি বলে সমালোচনা করলেও মূলত ৬দফাকে স্বায়ত্বশাসনের কর্মসূচি হিসাবে সমর্থন করল। ন্যাপের অভ্যন্তরে মস্কোপন্থীরা প্রথমদিকে এই প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ করলেও অল্পকিছুদিনের মধ্যে এই প্রশ্নে মওলানা ও অন্যান্যদের সমালোচনা শুরু করলেন। চট্টগ্রামে লালদিঘির ময়দানে এক জনসভায় ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষিত হবার অব্যবহিত পরে হাজী দানেশ থেকে মতিয়া চৌধুরী পর্যন্ত সবাই ৬ দফা সম্পর্কে এক ধরনের বক্তব্য হাজির করেন। সভায় ৬ দফা পন্থীরা গোলযোগ সৃষ্টি করতে গিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যান। মওলানা ভাসানী ৬ দফার সত্যিকার বিকল্প হিসেবে তাঁর এক দফা সমাজতন্ত্রের কথা সর্বত্র প্রচার করতে থাকলেন। তিনি বললেন সমাজতন্ত্র হলে পূর্ব-পশ্চিম, ধনী-গরিব সকল প্রকার বৈষম্যেরই অবসান হবে। আসলে ৬ দফাতে তেমন নতুন কোনো বক্তব্য ছিল না। '৫৭ সাল থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি যে ফরমুলার ভিত্তিতে পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে আসছিল ৬ দফা তারই দফাওয়ারি বিস্তারিত ব্যাখ্যা মাত্র। বরং ৬ দফা তার তুলনায় আংশিক কর্মসূচিমাত্র। কারণ তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতিসমূহের জন্য স্বায়ত্বশাসন দাবি করা হয় নি। ন্যাপ স্বায়ত্তশাসন দাবি করত তার স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ও অন্যান্য প্রগতিশীল সামাজিক অর্থনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি। ৬ দফাতে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক কর্মসূচিও ছিল না। সুতরাং বামপন্থীরা একে পশ্চিমা পুঁজিপতির পরিবর্তে বাঙালি পুঁজিপতির রাজ্য কায়েমের প্রয়াস হিসেবেই দেখলেন। রাজনীতিতে সোহ্‌রাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য শেখ মুজিব ছিলেন দক্ষিণপন্থী, কমিউনিস্ট বিরোধী ও মার্কিন ঘেঁষা। সুতরাং তাঁর যে কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপকে

www.nagorikpathagar.org

বামপন্থীরা সন্দেহের চোখে দেখবেন এটাই তো স্বাভাবিক। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ভেঙে ন্যাপের জন্ম হয়েছিল। এককালের মওলানার চোখের মণি 'মজিবর' সেদিন মওলানার পাশে দাঁড়ান নি। বরং সেদিন তিনি সোহ্‌রাওয়ার্দীর পাশেই ছিলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দী তখন বলতেন ৯৮ ভাগ স্বায়ত্তশাসন হয়ে গেছে, সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের স্লোগান একটি রাজনৈতিক স্ট্যান্ট। '৬৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আমি নিজে যখন স্বায়ত্তশাসনের স্লোগান সংবলিত প্ল্যাকার্ড বহন করছিলাম আওয়ামী লীগ পন্থী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কিছু কর্মী ওটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনের সময় 'কপ'-এর ৯ দফা কর্মসূচিতে ছাত্র ইউনিয়নের ছেলেরা যখন স্বায়ত্তশাসনের দাবি অন্তর্ভুক্ত করতে চাপ দিয়েছিল তখন শেখ মুজিব বলেছিলেন, ওটা পরে হবে। আগে দেশে ডেমোক্র্যাসি আসুক। ডেমোক্র্যাসি এলেই সব প্রশ্নের সমাধান হবে। মাত্র ১ বছরের ব্যবধান স্বর্গে ও মর্ত্যে এমনকি ঘটনা ঘটে গেল যে শেখ মুজিব স্বায়ত্তশাসন তথা 'জাতীয় মুক্তি'র সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রবক্তা বনে গেলেন। এ কারণেই বামপন্থীরা তাকে সমর্থন দিতে নারাজ ছিল। অপরদিকে জাতীয় রাজনীতির আন্তর্জাতিক দিকটিতেও পরিবর্তন এসেছিল। এককালের মার্কিনের মিত্র আইয়ুব খান তখন মার্কিনের বিরাগভাজন। পাকিস্তানের বড় বুর্জোয়াদের স্বার্থে আইয়ুব সরকার আমেরিকার পাক-ভারত কনফেডারেশনের প্রস্তাব নাকচ করে দিচ্ছিলেন। মার্কিন চাপের নিকট বশ্যতা স্বীকার না করার অপরাধে আইয়ুব খান আমেরিকার কাছে থেকে নানারূপ শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এদিকে আসল শেখ মুজিবের মাধ্যমে ৬ দফার হুমকি, অন্যদিকে তাসখন্দ সম্মেলনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ পন্থীদের লাহোর সম্মেলন। বামপন্থীরা দেখলেন সাম্রাজ্যবাদীরা শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে মার্কিন ও ভারতের একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র কায়েম করাতে চায়। এ কারণেই তাঁরা শেখ মুজিবের সঙ্গে কোনোরূপ সহযোগিতা করতে রাজি ছিলেন না। তবে মার্কিনরা পূর্ব-বাংলাকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল কিনা তা প্রশ্নসাপেক্ষ। বোধ করি তারা এটাকে চাপের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

অপরদিকে মস্কোপন্থীরা আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন ওয়ালী ন্যাপ দাঁড় করিয়ে ফেলেছেন। মস্কোপন্থীরা বলতে শুরু করলেন ৬ দফাতে সাম্রাজ্যবাদের অভিসন্ধি থাকলেও একে সমর্থন দিয়ে একে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করতে হবে। গণ আন্দোলন গড়ে উঠলেই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যাবে ও প্রকৃত মুক্তি সংগ্রাম গড়ে উঠবে। অথচ সেই সময় রুশ পত্রিকা 'ইজভেস্তিয়া'য় এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী যোগসাজসের কথা এক নিবন্ধে স্বীকার করা হয়েছিল। ওয়ালী ন্যাপের পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা জনাব মাহ্‌মুদুল হক ওসমানীও এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বক্তব্যের সমর্থন করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

ছয় দফার প্রশ্নে বামপন্থীদের সবচেয়ে বড় ভুল হল তাঁরা বিকল্প কোনো পরিপূর্ণ কর্মসূচি হাজির করতে ব্যর্থ হন। কর্মসূচি যে তাঁরা চিন্তা করেন নি এমন নয়। ন্যাপ তার জাতীয় কমিটিতে ১৪ দফা বলে এক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই কর্মসূচির সপক্ষে কোনো ব্যাপক প্রচার ও আন্দোলন তাঁরা গড়ে তোলেন নি। কারণ তাঁরা ভয় করতেন, আওয়ামী লীগের পাশাপাশি তাঁদের আন্দোলনের ফলে যদি আইয়ুব সরকারের পতন হয় তা হলে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় এমন কোনো শক্তি ক্ষমতাসীন হবেন যারা পাক-চীন বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করবে না, সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদারী নীতি গ্রহণ করবে। আসলে সেই সময় থেকে বামপন্থীরা নিজেদের ওপর খুব কমই আস্থা পোষণ করতেন। সে রোগ তাঁদের আজোও আছে। সে কারণে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁদের থাকে না কোনো পরিষ্কার ভূমিকা।

বামপন্থী নেতৃত্বের রাজনৈতিক ক্লীবত্ব তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ কর্মীদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও মাও চিন্তাধারার প্রভাবে এইসব কর্মীরা বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির এক উগ্র কামনা নিয়ে ছাত্র ইউনিয়নে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে যে নেতৃত্ব সংগ্রাম করে বেরিয়ে এসেছেন তাঁরা হয়তো একটি সঠিক পথ বাতলাবেন। কিন্তু ক্রমাগত রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতা তাঁদেরকে হতাশ করে তোলে। ১৯৬৫ সালে এক সন্ধ্যার কথা, সলিমুল্লাহ্ হলের একটি রুমে (৫২ নং রুম) আমরা কজন ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী সমবেত হয়েছি। এদের মধ্যে ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, জনাব সামসুজ্জোহা মানিক (পরে কৃষকনেতা), জনাব আহমেদ কামাল (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রফেসর) ও তৎকালীন সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল সংসদের সহ সভাপতি জনাব মুহাম্মদ ইব্রাহীম (বর্তমানে ড. ইব্রাহীম পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক)। আমি জনাব মান্নান ভুঁইয়াকে প্রশ্ন করলাম দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে আওয়ামী লীগ অচিরেই পূর্ব-বাংলার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করবে। তখন আমরা কী করব? মান্নান ভুঁইয়া বললেন, ওরকম সময় আসলে কী করব তা ভাবা যাবে। জনাব আহমেদ কামাল আমাকে সমর্থন করে বলেন, ছাত্র লীগের ছেলেরা এখন থেকে বিচ্ছিন্নতার কথা ভাবছে। ক্রমান্বয়ে আওয়ামী লীগের ওপর এদের প্রভাব বাড়ছে। সুতরাং আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা আন্দোলনে যাবেই। আমি বললাম, সময় থাকতেই আমাদেরকে ভাবতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কিছুই করা যাবে না। আমি চাই না আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ধনিক বণিকদের রাজত্ব কায়েম হোক। সেটা হবে আমাদের জন্য চরম দুঃসময়। সামসুজ্জোহা মানিক তাঁর স্বাভাবিক ধীর স্থির কণ্ঠে বললেন, দেশে একটা সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র চলছে, আমরা সেই ষড়যন্ত্রে

www.nagorikpathagar.org

যোগ দিতে পারি না। আমি বললাম, পূর্ব-বাংলার জাতীয় প্রশ্ন যেভাবে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে তাতে করে পাকিস্তান থেকে পূর্ব-বাংলা বিচ্ছিন্ন হওয়াটা একরকম অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই আন্দোলনে আমাদেরকে অবশ্যই নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে। আমাদের নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলা স্বাধীন হলেও পূর্ব-বাংলা হবে এক নতুন পূর্ব-বাংলা সুতরাং সেই লাইনে গোটা বামপন্থী নেতৃত্বকে একযোগে কাজ করতে হবে। সেদিনকার মতো আলোচনা এখানেই শেষ হল।

৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেই শেখ মুজিব সারা বাংলাদেশ চষে বেড়াতে লাগলেন। ৬ দফা কর্মসূচি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। শেখ মুজিব যেখানেই জনসভা করেন সেখানেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একটা মামলা দায়ের করার পর তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। আইয়ুব খান বললেন, শেখ মুজিব ভাষার অস্ত্র প্রয়োগ করতে চান, আমরা অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগ করে তাঁকে স্তব্ধ করে দেব। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর এইসব কার্যকলাপ শেখ মুজিবকে আরো জনপ্রিয় করে তুলল। শাসকগোষ্ঠী স্বায়ত্তশাসনের মতো ন্যায্য দাবিকেও উপেক্ষা করে চলল। এদিকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর নানারূপ হামলা বুদ্ধিজীবী মহলকেও চরমভাবে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। শাসকগোষ্ঠীর এইসব কার্যকলাপ জনগণের বিক্ষোভের আগুনে ইন্ধন যোগালো কেবলমাত্র। শেখ মুজিব তাঁর ৬ দফা প্রচারের এক পর্যায়ে দেশরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হলেন। এদিকে '৬৬ সালের ৭ই জুন ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে ৬ দফার দাবিতে হরতাল পালিত হল। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আওয়ামী লীগ তেমন জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু ৭ই জুনের হরতালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকরাও আংশিকভাবে জড়িয়ে পড়ল। আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা অনেকেই গ্রেপ্তার হলেন। এইভাবে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বামপন্থীদের সমালোচনা সত্ত্বেও ৬ দফা উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে।

এমন সময় পাকিস্তানের রাজনীতিতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও কনভেনশন মুসলীম লীগের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আইয়ুব মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। তাসখন্দ চুক্তির পর থেকে আইয়ুবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। তদুপরি '৬৬ সনের জানুয়ারিতে জাতীয় পরিষদের ঢাকা অধিবেশনে এসে তিনি মুজিবের সঙ্গে ৬ দফার প্রশ্নে প্রকাশ্য বিতর্কের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলি হেলনে সেই বিতর্ক আদৌ অনুষ্ঠিত হল না। ভুট্টোর এইসব রাজনৈতিক উদ্যোগ আইয়ুবের নিকট তাঁকে অপ্রিয় করে তুলল। জাতীয় পরিষদের জানুয়ারি অধিবেশনের সময় ভুট্টোর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল বুড়িগঙ্গায় এক নৌবিহারে। তিনি তখনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী। মুসলীম লীগের প্রাক্তন এম এন এ জনাব এন, এ, লস্কর একটি লঞ্চে নৌবিহারের আয়োজন করেছিলেন। এতে আমন্ত্রিত

www.nagorikpathagar.org

হয়েছিলেন ড. আবু মাহ্‌মুদ। এতে আরো ছিলেন লেবার পার্টির নেতা জনাব ফয়জুর রহমান। তিনি তখন অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল সংস্থায় চাকুরি করতেন। চাকুরি করলেও ধীরে ধীরে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছিলেন। ড. আবু মাহ্‌মুদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই এই নৌবিহারের আয়োজন করা হয়। ড. আবু মাহ্‌মুদ সেকালে একজন বামপন্থী চিন্তাবিদ হিসাবে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করতে গিয়ে তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনায়েম খান ও তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর জনাব ওসমান গনির (বর্তমানে ডেমোক্রেটিক লীগ নেতা) বিরাগভাজন হন ও এন এস এফের পাণ্ডাদের দ্বারা নৃশংসভাবে প্রহৃত হন। ড. আবু মাহ্‌মুদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই সাক্ষাৎকারের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে আমি কী করে সেই আসরে ঠাঁই পেলাম। জনাব ভুট্টো দু-একজন তরুণ বামপন্থী ছাত্র কর্মীর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। কারণ সেই সময় থেকে কনভেনশন লীগের বাইরে তিনি আলাদা সংগঠন গড়ে তোলার কথা ভাবছিলেন। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বামপন্থী তরুণ কর্মীদের মনোভাব তিনি বুঝতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন আরেকজন ছাত্র তার নাম আজিজ আহ্‌মদ। তিনি এখন কানাডায় পড়াশুনা করছেন। সেই সুবাদেই আমাদের যাওয়া। জনাব ভুট্টোর সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক প্রসঙ্গে আলাপ হল। আমরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যার কীভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে? তিনি জবাব দিলেন, Kashmir problem can only be solved within the framework of a united socialist India, আমার ভাবতে অবাক লাগে পাকিস্তানের মতো একটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী করে এ উক্তি করেছিলেন। বোধ করি একটা সুদুর প্রসারী ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল তাঁর এই উক্তির ভিত্তি। সেই সময় ঘানা ও ইন্দোনেশিয়াতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নক্রমা ও সুকর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। আমরা প্রশ্ন করলাম, কী করে সুকর্ণর মতো জনপ্রিয় নেতাকে সামরিক বাহিনী ক্ষমতাচ্যুত করল। তিনি সুকর্ণ-এর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের কাহিনী বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, সি আই এর চক্রান্তের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। দুনিয়ার সব দেশেই জাতীয় বুর্জোয়া নেতাদের ভাগ্যেই এমন ঘটনা ঘটে থাকে। তিনি আরো বললেন, "When Mao-Tse-Tung comes, he stays; when HoChiMinh comes, he stays; but when Soekerno comes; he goes, when Nkrumah comes, he goes," আমার মনে হয় এসব উক্তির মাধ্যমে ভুট্টো আমাদের চমৎকৃত করতে চেয়েছিলেন। আমাদের পক্ষে ভুট্টোর সমর্থনে দাঁড়ানর প্রশ্ন ছিল না, কারণ আমরা তখন থেকেই বুঝেছিলাম, পূর্ব বাংলার পথ পশ্চিম পাকিস্তানের পথ থেকে আলাদা হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

ভুট্টো বাংলাদেশের বামপন্থীদের সমর্থন না পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানের উদীয়মান তরুণ বামপন্থীদের বিরাট সমর্থন পেয়েছিলেন এই অংশের নেতৃত্বে ছিলেন জনাব মেরাজ মোহাম্মদ খান ও জনাব রশীদ হাসান খান। এঁদের প্রথমজন ছিলেন শ্রমিক নেতা ও অপরজন ছাত্র নেতা। ভুট্টোর পার্টির জঙ্গি শাখাটি এরাই গঠন করেছিলেন। এঁদের দুজনের সঙ্গেই '৬৭ সালের দিকে ঢাকায় আমার বিস্তারিত আলাপ হয়েছিল। এঁরা উভয়েই ছিলেন মার্ক্সবাদী আমি তাঁদেরকে প্রশ্ন করেছিলাম 'আপনারা কী করে ভুট্টোর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন?' তারা জবাব দিলেন, ভুট্টো শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন না। কিন্তু বর্তমানে আমরা তাঁকে নিয়ে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারি ও জনগনকে র‍্যাডিকালাইজ করতে পারি।' পররাষ্ট্র মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর পাকিস্তানে ভুট্টোর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে পৌঁছেছিল। করাচির রেলস্টেশনে লাহোর থেকে করাচি পৌঁছার পর ভুট্টো এক বিপুল গণ-সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। সেখানে তাঁর অশ্রুমাখা রুমাল নিলামে দশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল। ভুট্টো তখনো কোনো পার্টিতে যোগ দেন নি বা কোনো পার্টি গঠন করেন নি। কথা উঠেছিল তিনি ভাসানী ন্যাপে যোগদান করবেন ও পাকিস্তানে ন্যাপের সেক্রেটারি জেনারেলের পদ অলংকৃত করবেন। গদি ছেড়ে ঢাকা শহরে আসার পর ভাসানী ন্যাপের প্রাদেশিক শাখার কিছু নেতা ঢাকা বিমানবন্দরে ভুট্টোকে মাল্যভূষিত করেন। এঁদের মধ্যে আনোয়ার জাহিদ ও কামরুননাহার লাইলী উল্লেখ্য। এ নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন মহলে প্রবল সমালোচনার রব উঠে। এটাকে কেউ কেউ এইসব নেতাদের আইয়ুবের প্রতি মোহ বলে বর্ণনা করে। কিন্তু আসলে তা সেই ধরনের ব্যাপার ছিল না। কারণ ভুট্টো তো আইয়ুব কেবিনেট ছেড়েই এসেছিলেন। মার্ক্সবাদী পণ্ডিতরা এটাকে দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ভুট্টো নিজেই পি পি পি গঠন করেন। তিনি হলেন এর চেয়ারম্যান। তবে সে আমলে ভাসানী ন্যাপের সঙ্গে পি পি পি-র একটা সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ছিল। ভুট্টো ভাসানীকে শ্রদ্ধা করতেন।

এদিকে ৬ দফার প্রেক্ষিতে আমাদের কী করনীয় তা নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন মহলে বেশ একটা বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হল। গণচীনেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা হল। চেয়ারম্যান মাও হেড কোয়ার্টারে তোপ দাগার আহ্বান জানালেন। আমরাও মনে করলাম রাজনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য হেড কোয়ার্টারে তোপ দাগার প্রয়োজনীয়তা আছে অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে নেতৃত্বকে অস্বীকার করতে হবে। এমনি এক সময়ে আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স ব্যুরোর এক প্রতিনিধি দল ঢাকা আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স ব্যুরোর সেক্রেটারি জেনারেল আর ডি সেনানায়ক, সুদানের কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি জনাব আহম্মদ মোহাম্মদ খায়ের, মোজাম্বিক মুক্তিফ্রন্টের নেতা দা ক্রুজ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

www.nagorikpathagar.org

একজন সদস্য। তারা হোটেল শাহ্‌বাগে উঠেছিলেন। আমি নিজের তরফ থেকেই একটা তাড়া বোধ করলাম চীনের পার্টিকে আমাদের জাতীয় পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ ঘটনা জানানোর। হয়তো তাঁরা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত নন। প্রায় দু-ঘন্টা ধরে দোভাষীর মাধ্যমে চীনা পার্টির নেতার সঙ্গে আলোচনা চলল। তিনি কেবল শুনলেন, কোনো মন্তব্য করলেন না। কিন্তু খুব ধৈর্যসহকারে শুনছিলেন। আমি বোঝাতে চাইলাম ৬ দফার আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব-বাংলায় একদিন স্বাধীনতার আওয়াজ উঠবে। এটাকে কেউ রোধ করতে পারবে না। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব-বাংলা বিচ্ছিন্ন হলে চীনের সঙ্গে তার সদ্ভাব থাকবে না। একারণেই বামপন্থীদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ অপরিহার্য। তাঁর মুখভঙ্গি দেখে আসল প্রতিক্রিয়া কী কিছুই বোঝা গেল না। তবে এইটুকু বুঝতে পারলাম স্বদেশে ফিরে গিয়ে তিনি পার্টিকে এ ব্যাপারে রিপোর্ট করবেন। এসব কথার ফাঁকে ফাঁকে শ্রীলঙ্কার আর ডি সেনানায়ক বলতে চাইলেন তোমাদের কর্তব্য হবে শ্রমিক, কৃষক ও জাতীয় বুর্জোয়াকে নিয়ে সাম্রাজ্যেবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঐক্যজোট করা। তাঁর দৃষ্টিতে আইয়ুবই ছিল জাতীয় বুর্জোয়া প্রতিনিধি। আমার কথাটা পছন্দ হল না। বরং দা ক্রুজের কথা অনেকটা পছন্দ হল। তিনি বললেন, শাসকগোষ্ঠী সম্পর্কে কোনো মোহ পোষণ করো না, সংগ্রামে নাম। সংগ্রামই তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। পরিশেষে বলতে গেলে বিভ্রান্ত হয়েই ফিরলাম। দা ক্রুজ আরেকটি কথা বলেছিলেন। সেটা হল মোজাম্বিকের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কী পরিবর্তন এসেছিল। তিনি বলেছিলেন ১৮ বছর বয়সে আমি স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে নামি। আমি ছিলাম খুব রোগা ও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত। কিন্তু সংগ্রামের প্রক্রিয়া আমাকে সুস্থ করে তুলেছে। আমি এখন সম্পূর্ণ নীরোগ।

এমনিতর রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে আসল '৬৭ সালের ছাত্র ইউনিয়ন সম্মেলন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ছাত্র ইউনিয়নে মেরুকরণ শুরু হল। ছাত্র ইউনিয়নে জাফর-মেননের সমর্থক অংশ প্রথমে অচিন্ত্য সেন ও পরে হায়দার আনোয়ার খান রনোকে সাধারণ সম্পাদকের পদের জন্যে সমর্থন জানাতে থাকলেন। অপরদিকে আমি সমর্থন পেলাম ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যেকার নতুন নেতৃত্বের ও অন্যদিকে প্রবীণ নেতৃত্বের তরফ তেকে জনাব আবদুল হক ও অন্যান্যের। মেননদের সমর্থকরা আবদুল হকের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার শুরু করলেন। আমরা সেটাকে খুব ঢাকবার চেষ্টা করলাম না। কারণ তাঁদের সঙ্গেও ছিল আমাদের চিন্তার জগতে পার্থক্য। আবদুল হক পাকিস্তানের সংহতিকে বিশ্বাস করতেন। আমরা বিশ্বাস করতাম পুর্ব-বাংলার স্বাধীনতায়, জনগণতান্ত্রিক পূর্ব-বাংলায়। তৎকালে হক ও তোয়াহা এক গ্রুপভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যেও ছিল চিন্তার পার্থক্য। তোয়াহা বলতেন, তিনি অনেক আগে থেকেই পৃথক পূর্ব-বাংলার কথা ভাবতেন এবং ১৯৫০

www.nagorikpathagar.org

সালে এদেশের একটি পত্রিকায় পূর্ব-বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা লিখেছিলেন। এদিকে '৬৭ সনের বসন্তকালে নক্‌শালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান হয়েছে। রাশেদ খান মেনন '৬৬ সালের ২৯শে জুলাই বন্দি মুক্তি আন্দোলন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। জেল থেকে তিনি জানালেন, নক্‌শালবাড়ি অভ্যুত্থান সম্পর্কে তার রিজার্ভেশন আছে। এসব উক্তি ছাত্র ইউনিয়নের জঙ্গি অংশ থেকে তাঁদের কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। ফল স্বরূপ আমাদের প্রতি তাদের সমর্থন গেল বেড়ে। এমনকি আবদুল হক নিজেও আমার সঙ্গে এক আলোচনায় বললেন, দেশহিতৈষী পড়নি? ওখানে লিখেছে নকশালবাড়ির অভ্যুত্থান হল পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য সি আই এ ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত। প্রথম দিকে এটাই ছিল নক্‌শালবাড়ি অভ্যুত্থান সম্পর্কে আবদুল হকদের মনোভাব। পরে যখন 'পিকিং রিভিউ' একে স্বাগত জানালো তখন তাঁরাও এর বড় সমর্থক হয়ে গেলেন। একেই বলে মার্ক্সবাদে নকলনবিশি। মার্ক্সসাবাদ সৃজনশীলভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে এমনি হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

ছাত্র ইউনিয়নে জাফর-মেননদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক বিরোধ এমনিভাবে তীব্র হতে থাকে। তদুপরি সাংগঠনিক কারণেও বিরোধ দানা বেঁধে উঠে। সাংগঠনিক বিরোধের কারণ ছিল সংগঠনে ব্যক্তিগত আধিপত্য ও ব্যক্তিপূজাবাদ। এই ধরনের বুর্জোয়া প্রবণতার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠে। এ ছাড়া জাফরপন্থীদের তরফ থেকে চীনের সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সম্পর্কেও আপত্তিকর মন্তব্য হতে থাকে। একারণেও তাঁরা জঙ্গি-কর্মীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। এমনি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিরোধী পক্ষের চক্রান্তের জালকে ছিন্ন করে আমার সমর্থকরা আমাকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করতে সমর্থ হন। বহুদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এটাই ছিল কর্মীদের সফল বিদ্রোহ।

এ সময় শাসকগোষ্ঠীর জুলুম অত্যাচার ও চরমে পৌঁছে। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণ, ১৪৪ ধারা, লাঠি-গুলি, জেল-জুলুম নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সরকার বিরোধী ছাত্রদের উপর সরকারি ভাড়াটে ছাত্র-সংগঠন এন এস এফ-এর অত্যাচার উৎপীড়নও চরমে পৌঁছে। এন এস এফ নামধারী কতিপয় পাণ্ডা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোকে সকল প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত করে।

এমনি এক পটভূমিতে আমাদের ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে বিপ্লবী প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য এক উদগ্র আকঙ্ক্ষার সৃষ্টি হল। অপরদিকে ছাত্রলীগ কর্মীদের একাংশ ভাবতে শুরু করলেন সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর নেই। স্পষ্টতঃই বুঝতে পারলাম যে সমাজে স্বাভাবিকভাবে বিক্ষোভ প্রকাশের পথ যখন

www.nagorikpathagar.org

রুদ্ধ হয়, ন্যায় বিচার লুপ্ত হয় সেরকম সমাজেই বিপ্লব ও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রেরণা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হতে থাকে। ছাত্র লীগের এই অংশটির গুরু ছিলেন জনাব সিরাজুল আলম খান। '৬২-৬৩ তে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় নেবার পর জনাব খান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র ছিলেন না। কিন্তু তিনি ইকবাল হলেই অবস্থান করতেন, মাঝেমধ্যে মেডিকেল হোস্টেলে থাকতেন। লাল রং-এর একটি ৫০ সি সি হোন্ডা নিয়ে সারা শহরময় ঘুরে বেড়াতেন এবং কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতেন। '৬৬ সনে ৭ই জুনের হরতালের পর আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের প্রথম কাতারের নেতৃত্ব কারারুদ্ধ হয়ে পড়লে বস্তুত সিরাজুল আলম খানই সংগঠনের চেইন রক্ষা করে কর্মীদের মনোবল বজায় রাখতে সহায়তা করেন। '৬৮ সনে ইকবাল হলে তাঁর রুমে গিয়ে দেখেছি তিনি ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে মার্ক্স লেলিন ও মাওসেতুঙের বই বিলি করতেন ও পড়তে বলতেন। মাঝে মাঝে এইসব কর্মীদের নিয়ে স্টাডি ক্লাসেরও আয়োজন করতেন। আওয়ামীলীগের দুর্দিনে তাঁর এই কর্মতৎপরতার ফলে বিশেষ কোনো পদে অধিষ্ঠিত না থাকা সত্ত্বেও আওয়ামীলীগে তাঁর গুরুত্ব খুব বেড়ে যায়। একবার তিনি জানালেন (৬৮ সাল) তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই আওয়ামী লীগে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, জোট নিরপেক্ষতা ও সিয়াটো, সেন্টো ত্যাগের কর্মসূচি গৃহীত হয়। তবে সেই সময় তিনি আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারালেল কোনো সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন কিনা তা আমার জানা নেই।

তখনকার দিনে আন্দোলনের প্রশ্নে ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ ও ছাত্রগিগ একযোগ কাজ করত। কিন্তু ৬ দফা আন্দোলনের পর থেকে এই ঐক্য অটুট রাখা এক সুকঠিন সংগ্রামের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্রলীগ যে কোনো ইস্যুতেই ৬ দফা সমর্থন করাকে ঐক্যের ভিত্তি হিসেবে দাবি করত। অপর দিকে আমরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে প্রধান শর্ত হিসেবে হাজির করতাম, এতে করে ঐক্য অর্জন দুরূহ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু রাজনীতিতে আপসের কোনো ঠাঁই নেই। অপরদিকে মতিয়া গ্রুপ ৬ দফাকে সমর্থন করত বলে একটা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। তাঁদের এই সুবিধাবাদী অবস্থানের ফলে ছাত্র-ঐক্য অর্জন করা একটা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ও ১৭ই সেপ্টেম্বরের মতো দিবসগুলো পালন করার ব্যাপারে এক নাজুক পরিস্থিতির উদ্ভব হত। আমরা বলতাম ছাত্রলীগের উচিত নয় তাদের দলীয় কর্মসূচি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাঁরা বলত ৬ দফা যেহেতু বাঙালি জাতির কর্মসূচি সুতরাং এই প্রশ্নে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। বিশেষ করে মতিয়া গ্রুপের সমর্থনে বলীয়ান হয়ে তারা আমাদের ওপর তাদের কর্মসূচি চাপিয়ে দিতে চাইত। কিন্তু আমরা আমাদের বিঘোষিত নীতি থেকে একচুলও নড়ি নি বলে ওরা আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা মেনে নিতে বাধ্য হয়। কেননা ঐক্য তাদেরও

www.nagorikpathagar.org

দরকার। তাদের বহু কর্মী, নেতা আইয়ুবের কারাগারে। একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে কোনো কায়দা হবে না এটা তারা বুঝতে পেরেছিলেন। সবকিছুর উর্ধ্বে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপলব্ধি আদর্শগত মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও তৎকালে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল। বিভিন্ন সময়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে ৬ দফার স্লোগানটি নয় ৬ দফার মধ্যেকার কর্মসূচিগুলোকে গ্রহণ করে আমরা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচিগুলো প্রণয়ন করতাম।

আটষট্টি সালের অক্টোবরে এন এস এফের পাণ্ডা সাইদুর রহমান নিহত হল। সাইদুর রহমানদের অত্যাচার অবিচার চরমে পৌঁছলে তার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে এই ঘটনাটি ঘটল। ঘটনাটি ঘটে সলিমুল্লাহ্ হলে রাত ৮—৯ টায় দিকে। এরকম কোনো ঘটনা ঘটবে তা কস্মিনকালেও ভাবতে পারি নি। আমি এ সময় মহসীন হলে জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হকের রুমে। জনাব হক সে সময় বাংলা বিভাগে গবেষণা করেন। এন এস এফের পাণ্ডারা সব মুসালম হলে জড়ো হয়েছিলে নিঃখরচায় রোস্ট খাবার উদ্দেশ্যে। এর কিছুদিন আগে অর্থনীতি বিভাগের কৃতিছাত্র রেজওয়ানুল ইসলাম (বর্তমানে ড. রেজওয়ানুল ইসলাম) ও খালেদকে এন এস এফ এর জনৈক পাণ্ডা অহেতুক মারধোর করেছিল। এরা উভয়ই ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে বেশ কিছুদিন ধরে উত্তেজনা চলছিল। আমি জনাব হকের রুম থেকে মুসলিম হলে ফিরে আসার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ক্লাবের সামনে জনৈক ছাত্রের কাছে শুনতে পেলাম মুসলিম হলে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে গেছে। সেখানে এখন কুরুক্ষেত্রের লড়াই চলছে। সুতরাং মুসলিম হলে যাওয়াটা নিরাপদ বোধ করলাম না। রাতে মহসীন হলে সৈয়দ রুহুল আমীনের রুমে থাকলাম। রুহুল আমীন ছিলেন আমাদের মহসীন হল শাখার সভাপতি। সাইদুর রহমানের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা ঢাকায় উইচ হান্টিং শুরু হয়। ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা যে যেদিকে পারলেন পালিয়ে বাঁচলেন। ঘটনার দুদিন পর আমি মুসলিম হলে আসলাম আমার জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য। হলের দারোয়ান হাশমত দেখেই বলল, স্যার কেন এসেছেন? শিগগির পালান। আপনাকে পেলেই ওরা মেরে ফেলবে। সৌভাগ্যবশত ওরা কেউ হলে ছিল না। আমি ধীরে সুস্থে গোসল সেরে আমার ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পরদিন গেলাম মাদারীপুর। সেখানে সম্মেলন হল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। মুসলিমলীগের লোকেরা সম্মেলন প্যান্ডেলে আক্রমণ চালাবার পাঁয়তারা করছিল। কিন্তু শ্রমিক নেতা বাদশা মিয়ার নেতৃত্বে বিড়ি শ্রমিকরা আমাদের সহায়তা করায় তাদের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। এর পরদিন আসলাম ফরিদপুর ছাত্র ইউনিয়ন সম্মেলনে। ঐ সম্মেলনে কৃষক নেতা আবদুল হক, আবদুল মতিন ও আলাউদ্দিন আহম্মদ নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল হক সাহেব দুপুরের পরেই বিদায় নিলেন। আলাউদ্দিন আহ্মদ ও আবদুল মতিন যাবেন রাতের

www.nagorikpathagar.org

গাড়িতে। এদিকে বৈকালিক অধিবেশনে আমি রাজনৈতিক বক্তব্য রাখছিলাম। এমন সময় বাইরে থেকে খবর এল একদল সরকারি পাণ্ডা আমাকে কিডন্যাপ করার পাঁয়তারা করছে। আমাদের কর্মীরা খবরটা পাওয়ামাত্র আমাকে বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করতে স্লিপ দিলেন। বক্তৃতা শেষ হবার পর তারা আমাকে জনাব জাহিদ হোসেনের বাড়িতে নিরাপদে রেখে এলেন। জাহিদ হোসেন তখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও আমাদের সমর্থক। রাতের বেলা জনাব আলাউদ্দীন আহম্মদ ও জনাব আবদুল মতিন ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জাহিদ হোসেনের বাড়ির কাউকে জাগানো সম্ভব হয় নি বলে তাঁরা চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু জনাব নাজমুল হক নান্নুকে রেখে গেলেন যাতে তিনি আমাকে সঙ্গে করে পাবনার শাহপুরে জনাব আলাউদ্দীন আহমদের বাড়িতে নিয়ে যান। পরদিন ঢাকা থেকে জনাব আহমেদ কামাল ফরিদপুর গিয়ে পৌঁছলেন। বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি ভাবছিলাম ঢাকাতেই ফিরে যাব। আহ্মেদ কামাল ঢাকাতে ফিরে যেতে বারণ করলেন, কারণ এন এস এফ-এর পাণ্ডাদের কবলে পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। সুতরাং সিদ্ধান্ত হল সেদিন রাতেই পাকশী হয়ে শাহপুর চলে যাব। নিরাপত্তার খাতিরে ফরিদপুর স্টেশন থেকে না উঠে ফরিদপুরের আগের স্টেশন অম্বিকাপুর থেকে গাড়িতে উঠলাম।

শুরু হল আমার আত্মগোপনের জীবন। শাহপুরে দিনকয়েক থেকে কয়েকটি কৃষক বৈঠকে অংশগ্রহণ করলাম। কৃষকদের নিয়ে কী ভাষায় আলোচনা করতে হয় তা আমার মোটেই জানা ছিল না। শাহপুরে কিছুদিন থাকার পর কৃষকদের সঙ্গে কথা বলার ভাষাটা কিছুটা আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হলাম। আমাকে কৃষকদের নিকট পরিচিত করান হল তাদের একজন ছাত্রবন্ধু হিসাবে। সেই সময় শাহপুর অঞ্চলে ধলতা প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন চলছিল। জনাব আলাউদ্দীন আহ্মদ ও অন্যান্য কৃষক নেতারা ধলতা প্রথার মাধ্যমে শোষণের রূপ বর্ণনা করে বক্তব্য রাখতেন। এইসব বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে তারা আর একটা কথাও বলতেন তা হল পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলাকে আলাদা করার কথা। এই ফেরারি জীবনের এক পর্যায়ে '৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়েছে। পত্রিকায় এই সংবাদ দেখামাত্রই অনুভব করলাম আমার অবিলম্বে ঢাকার পথে রওয়ানা হওয়া উচিত। অন্যথায় সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। বিশেষ করে আমাদের সংগঠনের কর্মীদের ছাত্রলীগ ও মতিয়া গ্রুপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগুনো কঠিন হবে। এই প্রয়োজনীয়তা আমি আরো বেশি অনুভব করলাম। যখন দেখলাম সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের পক্ষে স্বাক্ষর করেছেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব নুরুল হাসান ও প্রচার সম্পাদক জনাব নুর মোহাম্মদ খান। পরিষ্কার বোঝা গেল সংগঠনের সভাপতি জনাব জামাল হায়দরসহ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ সক্রিয়ভাবে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না।

www.nagorikpathagar.org

আমি ৭ই জানুয়ারি ঢাকায় চলে এলাম ও গোপনে কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলাম। এমনিভাবে ২০শে জানুয়ারি পর্যন্ত আত্মগোপন অবস্থায় কাটিয়ে দিলাম। এদিকে সংগঠনের মধ্যে যেসব কর্মীরা আমার সমর্থক ছিলেন তারা নুরুল আমীন ও অন্যান্য 'ড্যাক' (ডেমোক্র্যোটিক এ্যাকশন কমিটি) নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে একটি ইশতেহারের খসড়া তৈরি করেছেন। খসড়াটি আমি অনুমোদন করার পর ওটা ছাপিয়ে বিলি করার ব্যবস্থা করা হল। সম্ভবত ২০শে জানুয়ারির দিকে ঐ ইশতেহারটি বিলি করা হয়। এখানে উল্লেখ যে, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচির পাশাপাশি কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত 'ড্যাক' ৮ দফার একটি কর্মসূচি হাজির করেছিল। ওয়ালী ন্যাপ ও আওয়ামীলীগও 'ড্যাক' এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'ডাক' এর ৮ দফা কর্মসূচিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন কিংবা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দাবিসমূহ অন্তভুক্ত হয় নি। আওয়ামীলীগ তার এতদিনকার রাজনৈতিক অবস্থান পরিহার করে এই জোটের মধ্যে শামিল হয়, এর আগে আওয়ামীলীগ ৬ দফাকে বাদ দিয়ে কোনো ঐক্য জোটে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করত। আওয়ামীলীগ 'ড্যাক' এ অংশগ্রহণ করলেও ছাত্রলীগ 'ড্যাক' জোটকে পছন্দ করত না। এটাই ছিল তখনকার রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। ছাত্র সংগঠনগুলো একেবারেই রাজনৈতিক দলের লেজুড়ে পরিণত হয় নি। অনেক সময় ছাত্র সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর তুলনায় ভিন্নতর অবস্থান গ্রহণ করত। কিন্তু মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন ও মস্কোপন্থী ন্যাপ 'ডাক' এর প্রতি জোর সমর্থন দেয়।

এখানে উল্লেখ্য যে ভাসানী-ন্যাপ ইতঃপূর্বেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল '৭০ সালে অনুষ্ঠিতব্য আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না। আন্দোলন শুরু হয়ে যাওয়ার পর মস্কোপন্থী ন্যাপ ব্যতিরেকে আওয়ামী লীগসহ 'ডাক' ভুক্ত দলগুলিও নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনকে ডাক-এর সঙ্গে একাকার করে দিতে চাইত। তাঁরা বলত ডাক-এর ৮ দফা ও ছাত্র ১১ দফার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। ১১ দফায় ৮ দফাও আছে। কিন্তু সাধারণ ছাত্র সমাজ ঠিকই বুঝতে পেরেছিল ১১ দফা ও ৮ দফাতে মৌলিক তফাত কোথায়? ১১ দফা সংস্কারবাদী কর্মসূচি হওয়া সত্ত্বেও এতে ছিল ছাত্র শ্রমিক কৃষকদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়া। ছিল স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির দাবি। প্রগতিশীল বামপন্থীরা যেসব ইস্যুর কথা এতদিন বলতেন ১১দফাতে তার স্বীকৃতি মিলল। এদিকে ডাক বিরোধী ইশতেহার বিলি নিয়ে ছাত্রলীগ ও মস্কোপন্থী ছাত্রনেতারা উষ্মা প্রকাশ করলেন। এমনকি জামাল হায়দারও আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের এক কর্মী সভায় বললেন, যদি আমাদের কর্মীরা কেউ এ কাজ করে

www.nagorikpathagar.org

থাকে তা হলে তারা খুব নিন্দনীয় কাজ করেছে। এরাঁ কেউ বুঝতেন না ঐক্য ও সংগ্রামের প্রক্রিয়া। তদুপরি এই ইশতেহারে ১১দফার জোটকে নিন্দা করা হয় নি। নিন্দা করা হয়েছে একটি দক্ষিণপন্থী জোটকে। তা ছাড়া একটি বৃহত্তর আন্দোলনে সাধারণ কর্মী ও সমর্থকদের মত প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা না থাকলে তা কি সত্যিকারের গণ আন্দোলন হতে পারে? ২০শে জানুয়ারির বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আসাদুজ্জামান শহীদ হলেন। শহীদ আসাদ হলেন এদেশের গণ-আন্দোলনে প্রথম সচেতন কর্মী যিনি শাহাদত বরণ করেছেন। তিনি যেদিন শহীদ হলেন সেদিন বিকেল ৩টায় নগরীতে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মৌন মিছিল বের হল। সমস্ত নগরী শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মৌনতার ভাষায় সেই মৌন মিছিলের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল।

আসাদের আত্মাহুতি ১১ দফায় আন্দোলনকে দিল এক সর্বাত্মক সর্বব্যাপক রূপ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ২৪শে জানুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল ও বিক্ষোভের ডাক দিল। ২৩শে জানুয়ারি পর্যন্ত আমি ছিলাম আত্মগোপনে। ২৪শে জানুয়ারি গণ-অভ্যুত্থান সফল হল। শাসকগোষ্ঠী ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লক্ষ জনতার রুদ্র রোষ ফেটে পড়ল। বেলা ১২টার দিকে পাঁচ লক্ষ লোক ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে পল্টন ময়দানে এসে জমায়েত হয়েছে। ওরা সঙ্গে করে বয়ে এনেছিল দুজন শহীদের লাশ। শহীদ মতিয়ুর ও শহীদ রুস্তম। মতিয়ুর রহমান শহীদ হয়েছিলেন সেক্রেটারিয়েটের সামনে পুলিশের গুলিতে। লাশ দুটির মুখে প্রশান্ত পবিত্রতার ছাপ। আমিও আত্মগোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে জনতার সমুদ্রে যোগ দিলাম। সাইফুদ্দীন আহমেদ মানিকও ঐ একই দিন আত্মগোপন অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আমি যখন প্রকাশ্যে এসেছি তখন দেখতে পেলাম ১১ দফার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও একটি বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে রুদ্র রোষে ফেটে পড়া জনতাকে নানা কথা বলে শান্ত করার চেষ্টা করেছেন। মাঠের অপর প্রান্তে মোনেমের লাটভবন দেখা যাচ্ছে। সামরিক বাহিনীর লোকেরা লাট ভবনের দেওয়ালে হালকা কামান ও মেশিনগানের নল তাক করে আছে। বিক্ষুব্ধ জনতা নেতৃবৃন্দের কাছে হুকুম চাইছে লাটভবন ধূলিসাৎ করে দেওয়ায়। তখন বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত দিলেও, লাটভবনের প্রতিটি ইট জনতা খুলে ফেলতে। কিন্তু নেতৃবৃন্দ ভাবলেন এমন ধরনের ইঙ্গিত দিলে রক্তাক্ত ও বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে যাবে। জনতা পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণার দাবি জানাতে থাকে। ছাত্রলীগ ও মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা কিছুতেই তা করবেন না। আমি বললাম, পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করতে আমাদের আপত্তি কোথায়। ছাত্র নেতারা শহীদের প্রতি শ্রদ্ধার দোহাই দিয়ে ও জনতাকে দরুদ পড়ার আহ্বান জানিয়ে কিছুটা শান্ত করতে সক্ষম হলেন।

www.nagorikpathagar.org

শহীদদের জন্য জানাজা পড়া হল। মৌলবি সাহেব মোনাজাত করলেন "ইয়া আল্লাহ্ জালেমশাহী ধ্বংস করে দে, ইয়া আল্লাহ্ তুই অত্যাচারীর মুখ কালা করে দে।" প্রতিবার যখন মৌলবি সাহেব "ইয়া আল্লাহ্" বলছিলেন জনগণ সমস্বরে "ইয়া আল্লাহ" বলছিলেন।

জানাজা শেষে পল্টনের বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্র লাশ নিয়ে মিছিল করে ইকবাল হলের দিকে অগ্রসর হল। ইকবাল হলের মাঠে সমবেত ছাত্র জনতাকে উদ্দেশ্য করে প্রত্যেকেই কিছু বলার চেষ্টা করলেন। মাঝখান দিয়ে সিরাজুল আলম খান হুট করে মঞ্চ দখল করে লম্বা চওড়া বক্তৃতা শুরু করলেন। সিরাজুল আমল খানের অযাচিত হস্তক্ষেপ অনেকেরই পছন্দ হল না, তবুও প্রবীণ ছাত্রনেতা হিসেবে সম্মানের খাতিরে কেউ তেমন কোনো প্রতিবাদ করলেন না। শহীদ মতিয়ুরের পিতাও সেই সময় সন্তানের লাশ গ্রহণ করার জন্য এসে উপস্থিত জনতার প্রতি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি বললেন, শহীদ মতিউরকে হারিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই, মতিয়ুর দেশ দশের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে। কিন্তু এক মতিয়ুরকে হারিয়ে আমি লক্ষ মতিয়ুরকে পেয়েছি। জুলুম শাহীর পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মজার ব্যাপার এতসব আনুষ্ঠানিকতার পরও আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করার ব্যাপারে ছাত্রলীগ, মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন ও আমাদের একাংশ দোদুল্যমানতা প্রদর্শন করছিলেন। সকলের বিরোধিতার মুখে আমিও যে কী বলব বুঝে উঠতে পারছি না। অথচ কর্মসূচি ঘোষণা না করার অর্থ আন্দোলনের মৃত্যু। সবাই জনতাকে বোঝাতে চাইলেন নেতৃবৃন্দ বসে আলাপ করে সিদ্ধান্ত দেবেন। অথচ পরিস্থিতি এমনি যে উপস্থিত ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। জনাব বদর উদ্দীন উমর এক আলোচনা সভায় এই ঘটনাকে পেটি বুর্জোয়া ছাত্র নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, ছাত্রদের পক্ষে এর বেশি করা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন-এর জঙ্গি কর্মীরা আওয়াজ তুললেন, "আগামী দিনের কর্মসূচি ঘোষণা কর ঘোষণা কর।" জনগণ ও তাদের সংগে আওয়াজ তুলল, অবশেষে ছাত্র নেতারা বাধ্য হয়ে ২৫শে জানুয়ারি হরতাল ঘোষণা করলেন, শাসকগোষ্ঠী জারি করল কারফিউ। কারফিউ চলল কয়েকদিন, মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত বিরতি। ৩রা ও ৯ই ফেব্রুয়ারি পল্টনে জনসভা অনুষ্ঠিত হল। লক্ষ লক্ষ লোক জনসভায় সমবেত হয়। সারা দেশবাসী ছাত্রনেতারা কী বলেন, কী নির্দেশ দেন তার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতেন। ৯ ফেব্রুয়ারি সমাবেশে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি জনতার প্রতি তাদের শ্রেণী দাবি দাওয়া আদায়ের আহ্বান জানান হল। শুরু হল কারখানা কারখানায় ঘেরাও। এই ঘেরাও আন্দোলনের জনক ছিলেন মওলানা ভাসানী। '৬৮ সালের সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বিভিন্ন জেলা ও মহকুমার ডি সি ও এস ডি ওদের বাংলো ঘেরাও করে মওলানা জনগণকে ঘেরাও আন্দোলনের প্রক্রিয়া প্রস্তুত করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

সমাজ যখন এতকিছু করছেন জাতীয় নেতারা তখন ড্রয়িংরুমের নিরাপদ কক্ষে আশ্রয় নিয়েছেন। ড্যাক নেতাদেরও কোনো কর্মসূচি দেখা যায় না। ইতোমধ্যে তাঁরা পল্টনে একটি জনসভার আয়োজন করলেন। মেহনতি জনতার রুদ্ররোষে তাদের সভা পণ্ড হয়ে গেল। ড্যাক এর আগে মূল শক্তি ছিল জামাতে ইসলাম ও ইসলামী ছাত্র সংঘ। তাদের কণ্ঠে স্লোগান ছিল পাকিস্তানের উৎস কী? 'লা ইলাহা ইল্লালাহ', 'তোমার নেতা আমার নেতা, বিশ্ব নবী মোস্তফা', 'মস্কো না মক্কা, মক্কা মক্কা,' পিকিং না মক্কা মক্কা।' অপরদিকে জানতার আহ্বান হল, 'কেউ খাবে কেউ খাবে না, তা হবে না তা হবে না, জয় হবে জয় সর্বহারার হবে জয়, পাকিস্তান না বাংলা, বাংলা বাংলা। মাওলানা ভাসানীরও তখন কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। ন্যাপ নেতৃবৃন্দ তাঁকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর হদিশ পাচ্ছে না। শেষে তাঁকে দেখা গেল শাহজাদপুরের এক জনসমাবেশে বক্তৃতা করতে। তাঁকে ঢাকা নিয়ে আসা হল। ১৬ ফেব্রুয়ারি পল্টনে ন্যাপের সভা হল। সেই সভায় মওলানা ভাসানী ও মিয়া আরিফ ইফতেখারসহ ন্যাপ নেতারা বক্তৃতা করলেন। এমন সময় খবর আসল পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি করেছে। মওলানা বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করলেন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'শেখ মুজিবকে মুক্তি না দিলে আমরা ফরাসী বিপ্লবের মতো জেল ভেঙে মুজিবকে ছিনিয়ে আনব।' এই সময় সারা ঢাকায় আগুন জ্বলে উঠল। আগুন জ্বলল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান বিচারপতি জাস্টিস হামুদুর রহমানের বাসভবনে, মন্ত্রী সবুরের বাসভবনে, মন্ত্রী ভবানী শংকর বিশ্বাসের বাসভবনে, ও নওয়াব খাজা হাসান আসকারীর বাসভবনে। আবার কারফিউ জারি হল। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা ই পি আরের বেয়োনেট চার্জে নিহত হলেন। রাত ১১ টায় রেডিও পাকিস্তানের সংবাদ বুলেটিনে এই খবর প্রচারিত হলে নগরীর হাজার হাজার লোক কারফিউ ভেঙে মিছিলে চলে আসলেন। কারফিউ ভেঙে মিছিলে বেশিরভাগ অংশ নিয়েছিলেন বস্তির সর্বহারা মানুষ। রাতের অন্ধকারে সামরিক বাহিনীর গুলিতে কত লোক শহীদ হয়েছেন জানা নেই।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে শ্রমিকরা ঘেরাও ধর্মঘট শুরু করলে শ্রমিকশ্রেণী তাদের বেতন ও সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে বিরাট বিজয় অর্জন করলেন। ছাত্রদের হস্তক্ষেপে এসব ঘেরাও ধর্মঘটের নিস্পত্তি হত। ১৬ ফেব্রুয়ারির পর বেসামরিক প্রশাসনিক যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। রাস্তা থেকে পুলিশ প্রত্যাহার করা হয়। ফলে পুলিশ ও বিচারের দায়িত্ব ছাত্রদের ওপর বর্তায়। শত শত লোক বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে ইকবাল হলে আসতে থাকে। ছাত্ররা যে রায় দিত জনগণ তাই মেনে নিতেন। ইতোমধ্যে আইয়ুবের দূত হয়ে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ্ খান একটি গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকলেন। তিনি ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে শেখ মুজিবের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলেন। এক পর্যায়ে মুজিবও

www.nagorikpathagar.org

প্রায় রাজি হয়ে গেলেন প্যারলে মুক্তি নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। ছাত্ররা এই প্রস্তাব শোনামাত্র নানা প্রকার ধিক্কার দিল, ফলে শেখ মুজিব শক্ত হলেন। পরিশেষে সরকার বাধ্য হলেন তাঁকে মুক্তি দিতে। শেখ মুজিব ২২শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেলেন। তাঁর সঙ্গে আগরতলা মামলার অন্যান্য আসামিরাও মুক্তি পেলেন। আগরতলা মামলার (শেখ মুজিব ব্যতিরেকে) আসামিদেরকে জনতা পল্টন ময়দানে সংবর্ধনা দিলেন। ছাত্রলীগের নেতারা সংগ্রাম পরিষদের কোনো আলোচনা ব্যতিরেকে মাইকযোগে প্রচার করে দিলেন ২৪শে ফেব্রুয়ারি তাঁকে রেস কোর্সে গনসংবর্ধনা দেওয়া হবে। ছাত্রলীগের এই ধরনের ঐক্য বিরোধী কার্যকলাপে সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের মধ্যে উষ্মার ভাব সৃষ্টি হল। এ নিয়ে ইকবাল হলের ছাত্রসংসদ অফিসে ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতভর মিটিং হল। সকাল ১০টা পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত হল না। আমরা প্রস্তাব করলাম সকল রাজবন্দিকেই একযোগে সংবর্ধনা দিতে হবে। কারণ রাজবন্দি হিসেবে সকলেই আমাদের নিকট সমান। এমনকি জনাব ভুট্টোও সেই সংবর্ধনা সভায় থাকবেন। তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন। মুক্ত রাজবন্দিদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা দশ বছরেরও বেশি কাল আইয়ুবের কারাগারে বন্দি ছিলেন। দেশবাসীর জন্য তাঁদের ত্যাগ তিতিক্ষা কম নয়। কিন্তু মস্কোপন্থীদের নমনীয় ভূমিকার ফলে শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবকে আলাদা সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। দুপুর ২টার দিকে ছাত্র নেতৃবৃন্দ একটি জিপ সহযোগে তাঁকে নিয়ে আসতে তাঁর বাসভবনে গেলেন। সেবারই প্রথম আমার শেখ মুজিবের সঙ্গে পরিচয়। শেখ মুজিব বললেন 'হুজুর কী বলেন (মওলানা)? তিনি ঠিক থাকলে এবার বাঙালির সব দাবি দাওয়া আদায় হবে।' আমি বললাম আপনাকেও তো ঠিক থাকতে হবে। যথাসময়ে রেসকোর্সে জনসভা শুরু হল। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের পক্ষ থেকে আমি বক্তব্য রাখলাম। আমি আমার বক্তব্যে শেখ মুজিবকে স্মরণ করিয়ে দিলাম জনগণের বহু দাবিদাওয়া এখনো পূরণ হয় নি। জনগণের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করার জন্য শাসকগোষ্ঠী গোল টেবিল বৈঠকের টোপ ফেলেছে। এবার যদি শেখ মুজিব ১১ দফার প্রশ্নে আপস করেন জনগণ তা হলে তাঁকে ক্ষমা করবেন না। আমার বক্তৃতার একটি বিস্তারিত বিবরণ ২৫শে ফেব্রুয়ারি আজাদ পত্রিকায় বেরিয়েছিল, আমি যখন বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়লাম শেখ মুজিব আমার পিঠে হাত চাপড়ালেন। বললেন, "খুব তো বক্তৃতা দেওয়া শিখেছিস কিন্তু আমাকে বেকায়দায় ফেলেছিস।" এমন সময় ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের স্বঘোষিত আহ্বায়ক জনাব তোফায়েল আহমেদ মাইকের সামনে উঠে দাড়ালেন এবং বললেন "আমি জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে জনতার পক্ষ থেকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করছি"। জনতাকে তিনি হাত তুলে এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানাতে বললেন। জনতা এই প্রস্তাবকে ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদের প্রস্তাব মনে

www.nagorikpathagar.org

করে হাত তুলে সমর্থন জানাল। শেখ মুজিবের শাসনামলে জনাব তোফায়েল আহমেদের ভাগ্যোন্নতির জন্য এটা একটা বড় কারণ। তিনি শেখ মুজিবের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন, অথচ তখনকার সময়ের ছাত্রলীগের মূল দুজন নেতা জনাব আবদুর রউফ ও জনাব খালেদ মোহম্মদ আলীর আন্দোলন সংগঠিত করার প্রশ্নে বিরাট অবদান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের সেই অবদানের স্বীকৃতি পান নি। জনাব তোফায়েল আহ্মেদকে সংগ্রাম পরিষদের স্বঘোষিত আহ্বায়ক বলেছি একারণে যে সত্যিকার অর্থে সংগ্রাম পরিষদে কোনো নির্ধারিত বা মনোনীত আহ্বায়ক ছিল না। 'ডাকসু'র সহ-সভাপতি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐক্যলব্ধ আন্দোলনের অতীতরীতি অনুসারে সংগ্রাম পরিষদের সভাগুলোতে তিনি সভাপতিত্ব করতেন। এতেই তিনি জনগণের নিকট সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক প্রতিভাত হয়েছেন। পত্রিকাগুলো এ ব্যাপারে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করেনি।

শেখ মুজিব রেসকোর্সের সংবর্ধনা সভায় ভাষণদান কলে বললেন, ছাত্র সমাজ তাদের ১১ দফায় তার ৬ দফা অন্তর্ভুক্ত করায় তিনি কৃতজ্ঞ। তিনি আরো বললেন, গোল টেবিল বৈঠকে আমি যাব। সেখানে আমি ৬ দফা ও ১১ দফা দাবি পেশ করব। আমি কোনো আপস করব না। আমি কী আইয়ুব খাঁকে ডরাই যে আমি আপস করব?

মওলানা ভাসানী ও জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো সেদিন ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন। মওলানা ভাসানী জনাব সাইদুল হাসানের বাসভবনে উঠেছিলেন। সন্ধ্যার পর সেখানে আইয়ুবের দূত খাজা শাহাবুদ্দীন এলেন মওলানাকে গোল টেবিলে বসতে রাজি করাতে। এর কিছুক্ষণ পূর্বে জনাব ভুট্টোও এসেছেন মওলানা সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করতে গোল টেবিল বৈঠকের ব্যাপারে তাঁরা কী করবেন? উভয় নেতা একমত হলেন তাঁরা গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন না। খাজা শাহাবুদ্দীনকে মওলানা কিছু ফারসি বয়াত আউড়ে বিদায় দিলেন। বয়াতটির কথা আমার মনে নেই।

ভাসানী ও ভুট্টো ব্যতিরেকে সব নেতাই গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন। কিন্তু বৈঠকে মৌলিক কোনো প্রশ্নে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হল না। ছাত্রদের ১১ দফার কথাও শাসকগোষ্ঠী গ্রাহ্য করলো না। মওলানা আগেই ঠিক করেছিলেন যেহেতু বৈঠকের কোনো কর্মসূচি নেই সুতরাং আলোচনা নিরর্থক। গোল টেবিল বৈঠকে কেবলমাত্র একটি প্রশ্নে ঐকমত্য হল। তা হল সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার গঠন। ইতঃপূর্বে ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষণে আইয়ুব খাঁন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে বহাল না থাকতে সংকল্প ঘোষণা করলেন। এদিকে শেখ মুজিব গোল টেবিল বৈঠক শেষে আইয়ুব খানের সঙ্গে এক নৈশ ভোজে মিলিত হলেন। এই নৈশভোজ ৬ ঘণ্টা অব্যাহত ছিল। এই ৬ ঘণ্টায় তাঁরা কী

www.nagorikpathagar.org

আলোচনা করেছিলেন তা প্রকাশ হয় নি। তবে জনশ্রুতি উঠেছিল শেখ মুজিব সেই আলোচনায় আইয়ুব খানকে দেশের প্রেসিডেন্ট পদে বহাল রাখতে রাজি ছিলেন আর তিনি হবেন প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানের মার্কিন ঘেষা পুঁজিপতি হারুন গোষ্ঠী এ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেছিলো।

যখন গোল টেবিল বৈঠক চলছে মওলানা ভাসানী তখন গেলেন পশ্চিম পাকিস্তান সফরে। এ সময়ে মওলানা লাহোর থেকে করাচি পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা করেন। জনাব মোহাম্মদ তোয়াহাও তার সঙ্গে গেলেন। সফরের মাঝখানে তিনি ঢাকা ফিরে আসলেন, বিভিন্ন জায়গায় মওলানা জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। পাঞ্জাবের শাহীওয়ালে জামাতে ইসলামীরা মওলানার ওপর দৈহিক হামলা চালাল, এর প্রতিবাদে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ধর্মঘট বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হল। মওলানা তখন ইসলামী সমাজতন্ত্রের কথা বলতে শুরু করেছেন। আর পশ্চিম পাকিস্তান সফরের শুরু থেকেই জামাতীরা বিভিন্ন সভায় গোলযোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। এরই প্রতিবাদে সারা পশ্চিম পাকিস্তানের স্লোগান উঠে "এক মওদুদী- লাখ ইহুদি।"

এদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বি ডি চেয়ারম্যান মেম্বারদের পদত্যাগের আহ্বান জানায়। ফলে আন্দোলন গ্রাম বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। অত্যাচারী ও দুর্নীতিপরায়ণ বি ডি মেম্বারদের বিরুদ্ধে গণ-অভিযান শুরু হয়। গ্রামাঞ্চলে টাউট ও দুর্নীতি পরায়ণদের বিরুদ্ধে দ্রুত শ্রেণী জাগরণ শুরু হয়, ঘটনা লক্ষ করে তৎকালীন দেশরক্ষা মন্ত্রী শেখ এ আর খান মন্তব্য করেন, 'তৃতীয় শক্তি আন্দোলনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এরা হল কমিউনিস্ট।' এ থেকেই শাসক গোষ্ঠীর শ্রেণীভীতি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

মওলানা ভাসানী ঢাকা ফিরে এলেন। হাজার হাজার ছাত্রজনতা লাল পতাকা হাতে স্লোগান দিয়ে মওলানাকে স্বাগত জানাল। মওলানাকে একটা ট্রাকের ওপরে বসিয়ে মিছিলের পুরোভাগে রাখা হল। মওলানার দুপাশ ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা, জনাব কাজী জাফর আহমেদ, জনাব রাশেদ খান মেনন, জনাব জামাল হায়দর, জনাব মাহফুজ উল্লাহ্ ও আমি নিজে। মিছিলে স্লোগান উঠতে থাকল "নির্বাচন নির্বাচন বর্জন, বর্জন।" কর্মীদের মধ্যে নকশাল বাড়ি আন্দোলনের প্রভাবে এমনিতেই একটি নির্বাচন বিরোধী মনোভাব সংক্রমিত হয়েছিল। এর সঙ্গে মওলানার বিমান বন্দরের ভাষণ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি স্বরূপ হল, মওলানা বিমান থেকে অবতরণ করেই বললেন, "এবার যদি নির্বাচন হয় তা হলে প্রথমে অনুরোধ করব নির্বাচন বর্জন করতে, অনুনয় বিনয় করব, তাতেও যদি কর্ণপাত না করে তা হলে পোলিং বুথ জ্বালিয়ে দেব, জ্বালিয়ে দেব।"

তোয়াহা সাহেব নির্বাচন বর্জনের স্লোগান শুনতেই ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে আমার কানের কাছে মুখ রেখে মন্তব্য করলেন, 'জানি না কী হবে? তোমরা যা ইচ্ছা তা

www.nagorikpathagar.org

কর।' আমরাও দেখলাম শ্লোগানটা অত্যন্ত নেতিবাচক হয়ে যাচ্ছে। আমি ও জনাব রাশেদ খান মেনন কর্মীদের আহ্বান করে বললাম এই শ্লোগান নয়, শ্লোগান দাও "নির্বাচন না সংগ্রাম–সংগ্রাম সংগ্রাম", "ভোটের আগে ভাত চাই, নইলে এবার রক্ষা নাই।" মিছিল শহীদ মিনার পর্যন্ত গিয়ে শেষ হল। সেখানেও মওলানা এ একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন।

এদিকে শেখ মুজিব গোল টেবিল বৈঠক থেকে ফিরে এসে ঢাকা বিমানবন্দরে মন্তব্য করলেন, অধ্যাপক গোলাম আযম, মাহমুদ আলী, নুরুল আমীন প্রমুখ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাঁরা ছাত্রদের ১১ দফা সমর্থন করেন নি। মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আস্ফালন করে তিনি মন্তব্য করলেন, "মওলানা সাহেবের রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত"। মুজিবের এই উক্তি অনেককেই বেদনা দিয়েছিল। এই উক্তির পর ছাত্রলীগ কর্মীরা মাহমুদ আলীর বাড়িতে চড়াও হল।

সংবর্ধনা শেষে মওলানা ভাসানী সাইদুল হাসানের বাসায় উঠলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মাহবুব, মার্শাল'ল হলে তোমরা কী করবা?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরকম কিছু হবে নাকি? মওলানা মৌন থাকলেন, কথা ছিল পরদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেবেন। কিন্তু তা না করে রাতের বেলা সন্তোষ চলে গেলেন। মওলানা এমনিভাবেই তাঁর রাজনৈতিক পদক্ষেপকে রহস্যাবৃত করে রাখতেন।

এখন প্রশ্ন মওলানা কী সামরিক আইন জারি হবার খবর জানতেন? খুব সম্ভবত পশ্চিম পাকিস্তান সফর কালেই তিনি তা জানতে পেরেছিলেন। হয়তো এ ব্যাপার নিয়ে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর আলাপও হয়ে থাকতে পারে। সে ইতিহাস রহস্যাবৃত। এখন প্রশ্ন কী উদ্দেশ্যে মওলানা পোলিং বুথ জ্বালিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন? কোনো কারণ বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে মওলানার এসব উক্তি বেখাপ্পা মনে হয়েছিল। তবে মনে হয় দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকরা নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরবর্তীকালে আইয়ুবকে গদিতে বহাল রাখার জন্য যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাকে নস্যাৎ করার জন্যই মওলানা নির্বাচন বানচালের কথা বলেছিলেন।

২৫শে মার্চ রাত ৮টায় বেতার ভাষণের মাধ্যমে আইয়ুব খান সামরিক আইন ঘোষণা করলেন ও জেনারেল ইয়াহিয়ার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। আইয়ুব খান তাঁর ভাষণে বললেন "I cannot preside over the destruction of my country".

আইয়ুব খান বিদায় নিলেন বটে, কিন্তু পাকিস্তানের ধ্বংস রোধ করা গেল না। মাত্র দুবছরের মধ্যেই জন্ম হল নতুন রাষ্ট্র-বাংলাদেশের।

www.nagorikpathagar.org

জানুয়ারি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে

জানুয়ারি আন্দোলনের রক্তাক্ত স্মৃতি বিজড়িত দিনগুলো আবার আমাদের মাঝে ফিরে এসেছে। পৃথিবীর গণআন্দোলনের ইতিহাসে পূর্ব বাংলার জানুয়ারি আন্দোলন নতুন এক অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। সমগ্র দেশের জনতা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এত গভীরভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল যে ইতিহাসে তা নজীরবিহীন। পূর্ব বাংলায় জানুয়ারি মাস থেকে যে ধারাবাহিক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তাতে একমাত্র ছাত্রসমাজই ধারাবাহিকভাবে নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠনসমূহ এই আন্দোলনে কেবলমাত্র পরোক্ষ ভূমিকাই পালন করেছিল। কিন্তু ছাত্র নেতৃত্বসহ সকল প্রকার নেতৃত্বের ভূমিকা থেকেই এ কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে কোনো নেতৃত্বই উপলব্ধি করতে পারে নি আন্দোলন এত গভীর ও তীব্র আকার ধারণ করবে। ১৯৫৮ সাল থেকে স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের হিংসাত্মক নির্যাতন, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, মুৎসুদ্দি পুঁজি ও নির্মম জাতীয় নিপীড়নের ফলে জনগণ ও জনগণের শত্রু শিবিরের দ্বন্দ্ব অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করেছিল। দ্বন্দ্বের এই তীব্রতার সঙ্গে বিষয়বাদী অবস্থার সঠিক সমন্বয় ঘটলে বৈপ্লবিক পন্থায় বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করে জনগণের রাষ্ট্র তথা একটি জনগণের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হত। কিন্তু সাচ্চা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী পার্টি, গণবাহিনী ও সকল বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টের অনুপস্থিতির ফলে দ্বন্দ্বগুলোর সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে বিপ্লবী পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল সম্ভব হয় নি। ছাত্র সমাজ জনগণের সামনে ১১ দফা কর্মসূচি হাজির করেছিল। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC) প্রদান করেছিল ৮ দফা কর্মসূচি। এতদ্ব্যতীত আওয়ামী লীগের ৬ দফা, ন্যাপের ১৪ দফা ও ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের ছিল ৮ দফা কর্মসূচি। কিন্তু এই সকল কর্মসূচির মধ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচিই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আওয়ামী লীগ, মস্কোপন্থী ন্যাপ, পিডিএম ও জামাতের সমন্বয়ে গঠিত ড্যাক-এর ৮ দফা কর্মসূচিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, শ্রমিক কৃষকের দাবি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দাবি স্থান পায় নি বলে পূর্ববাংলার জনগণ ৮ দফার পতাকাতলে সমবেত হয় নি। এই কর্মসূচি শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তসহ পূর্ববাংলার বিভিন্ন নিপীড়িত শ্রেণীর ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষাসমূহের প্রতিফলন ঘটাতে পারে নি। ন্যাপের ১৪ দফায় সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের রূপরেখা ও সাংগঠনিক তৎপরতার অনুপস্থিতির ফলে ব্যাপক জনগণের মধ্যে সাড়া সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের ৮ দফা ছিল সামন্তবাদী পশ্চাৎমুখী আদর্শের একটি জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তাই দেশের প্রগতিশীল শ্রেণীগুলোর কাছে এর

www.nagorikpathagar.org

আবেদন ছিল অত্যন্ত সীমিত। আওয়ামী লীগের ৬ দফা উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতার স্ফুরণ ঘটালেও পূর্ব বাংলার ব্যাপক জনতা বিশেষ করে শ্রমিক কৃষকের কাছে এর কোনো মূল্যই ছিল না। এমনি রাজনৈতিক পটভূমিকায় ১১ দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তার কারণ আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। ১১ দফায় পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি শ্রমিক শ্রেণীর বাঁচার মতো মজুরি ও ধর্মঘটের দাবি মালিক-শ্রমিক, কৃষক ও জোতদারদের জমির খাজনা রহিত করার দাবি, ব্যাঙ্ক বীমা বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ, সেন্টো সিয়াটো বর্জন করে স্বাধীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ, পার্লামেন্টারি ফেডারেল গণতান্ত্রিক সরকার গঠন, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সকল প্রকার স্বৈরাচারী অর্ডিন্যান্স, দেশরক্ষা আইন ও নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিসমূহ স্থান পেয়েছিল ও ব্যাপক গণঐক্যের সূত্র রচনা করতে সমর্থ হয়। সমসাময়িক কালের অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনের ম্যানিফেস্টোর তুলনায় ১১ দফা এই কারণেই অনেক বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ড্যাক আহুত জনসভাগুলোতে দেখা গেছে পি ডি এম নেতা নুরুল আমীন ১১ দফাকে সমর্থন করেন কি না এই প্রশ্নে বেশ নাজেহাল হয়েছিলেন। এতৎসত্ত্বেও ১১ দফা একটি বুর্জোয়া সংস্কারবাদী কর্মসূচি। এমনকি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে সকল কর্মসূচি থাকে তাও স্থান পায় নি, যেমন সামন্তবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন সাধন করে অকৃষকদের জমি কৃষকদের হাতে বণ্টন, মহাজনী, ইজারাদারি তথা সকল প্রকার সামন্তবাদী শোষণের অবশেষ সমূহের উচ্ছেদ করা, সকল প্রকার বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ১১ দফায় এ সকল কর্মসূচি বিন্দুমাত্র স্থান পায় নি। তা ছাড়া বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কর্মসূচি বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বেই বাস্তবায়িত করা সম্ভব। কিন্তু বিগত গণআন্দোলনে মূল নেতৃত্বে ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ছাত্রদের নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণী চরিত্র থাকে না। তবুও আমাদের মতো একটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশে ছাত্ররা মূলত পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। চরিত্রের দিক থেকে এই শ্রেণী দোদুল্যমান ভূমিকা পালন করে। ১১ দফার কর্মসূচির মধ্যে এই পেটি বুর্জোয়া সুলভ দুর্বলতাগুলোর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। তাই আমরা দেখতে পাই এতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্থান পেলেও তা কোনোক্রমেই বিচ্ছিন্নতার অধিকারসহ আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি ছিল না। ব্যাঙ্ক, বীমা, বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করার দাবি উত্থাপিত হলেও রাষ্টযন্ত্রের চরিত্রের ব্যাখ্যা না থাকার ও তদুপরি বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি এবং বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি সরকার গঠনের দফার মাধ্যমে মূলত বুর্জোয়া একনায়কত্ব বহাল রাখাই ছিল ১১ দফার মূল বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া এই পদ্ধতির জাতীয়করণে আমলাতান্ত্রিক পুঁজিরই বিকাশ ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

১১ দফা কর্মসূচির ও নেতৃত্বের চরিত্র বিশ্লেষণ করার সাথে সাথে আমরা এই আন্দোলনে জনগনের যে সকল আকঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল তারও বিশ্লেষণ করব। বাস্তব আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণীবিদ্বেষ বেশ তীব্রভাবে প্রকাশ লাভ করেছিল। গ্রামাঞ্চলে আমলা, টাউট ও মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছিল গণবিচারের মাধ্যমে। সমাজ বিরোধী ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের শায়েস্তা করার জন্য গ্রামাঞ্চলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণবিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক গ্রাম থেকে খাস জমি ও শত্রু সম্পত্তি বণ্টনের খবর শোনা গেছে। শহরের শ্রমিকেরা তাদের দাবি দাওয়া আদায় করার জন্য ব্যাপকভাবে মিল মালিক ও সরকারি আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে 'ঘেরাও' অভিযান পরিচালনা করেছিল। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় জনগণ শোষণ পীড়নের অবসান কামনা করেছিল এবং এমন একটি সরকার গঠন করতে চেয়েছিল যা তাদের সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজির শোষণের কবল থেকে মুক্ত রাখবে। কিন্তু সকল জাতীয় নেতাই জনগণের সেই সব আকাঙ্ক্ষাকে বিভিন্ন কৌশলে শাসকশ্রেণীর কাছে আপসে বিকিয়ে দিয়েছিল। শেখ মুজিব ও ড্যাক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি বিরাট অংশ গোল টেবিল প্রহসনের মধ্য দিয়ে জনগণের ত্যাগ তিতিক্ষার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ তাদের স্বভাবসুলভ দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। এমন পরিস্থিতিতেই জানুয়ারি-মার্চের গণআন্দোলন তার যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। বিগত গণ-আন্দোলনের শক্তি ও সফলতার দিক হল স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের পতন, কিন্তু এই আন্দোলন স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে সক্ষম হয় নি। দেশে বর্তমান সামরিক সরকার ক্ষমতায় রয়েছে।

গণ আন্দোলনের পটভূমিকায় সামরিক শাসন নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে। আইয়ুবের সামরিক শাসনের সময় বলা হয়েছিল দেশের জনসাধারণ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের উপযুক্ত নয়। কিন্তু বর্তমান সামরিক সরকার পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর। এমনকি এই সামরিক সরকার পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের প্রশ্নে এমন অনমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে যে সত্যিকার অর্থে কোনো ধরনের গণতন্ত্র জনগণের কল্যাণ সাধন করতে পারে সেই বিতর্কের স্বাধীনতা দিতেও নারাজ। আইয়ুব সরকার যে শ্রেণী স্বার্থের প্রতিভূ ছিল ইয়াহিয়ার বর্তমান সরকারও সেই একই শ্রেণী স্বার্থের ধারক ও বাহক। কিন্তু এই সরকার নতুন এক মুখোশ পরে জনগণের কাছে হাজির হয়েছে সে হল পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রদানের মুখোশ। এতে কী আমরা আশা করতে পারি যে শাসক শ্রেণী স্বেচ্ছায় তার শ্রেণীস্বার্থ বিসর্জন দিচ্ছে? আসলে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ও দেশের বুকে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির শোষণ অক্ষুণ্ন রাখার কৌশল ক্যাথলিক ধর্মের আফিম সেবন করিয়ে যেমন

www.nagorikpathagar.org

করে শোষকশ্রেণী ইউরোপের শোষিত মানুষকে নির্জীব করে রাখতে চেয়েছিল তেমনিভাবে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের নেশায় মত্ত রেখে আজকের যুগে ধনিক শ্রেণী জনগণকে তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায় যেমনটি হয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। তাই আজ সামরিক সরকার ও শাসন ক্ষমতার বাইরে সকল বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী দলগুলোর একই স্লোগান "নির্বাচন কর, নির্বাচন করলেই সব সমাধান হয়ে যাবে।" কিন্তু এ ধরনের নির্বাচনে যে জনগণের সমস্যার সমাধান হয় না একথা জনগণের উপলব্ধিতে আসছে এবং শ্রেণী সংগ্রামও তীব্র হয়ে উঠছে। ১১ দফার স্লোগানকেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন শোষক শ্রেণী শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহারের প্রয়াস পাচ্ছে। আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান ছাত্রলীগ এটাকে ৬ দফার আলোকে ব্যাখ্যা করে বাঙালি ধনিকদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। মস্কোপন্থী ন্যাপ ও তাদের সহযোগী ছাত্র প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র ১১ দফার আওয়াজ তুলে বুর্জোয়া সংস্কারবাদী কর্মসূচির আওতাবদ্ধ হয়ে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থেই তল্পিবাহকের কাজ করছে। এমতাবস্থায় প্রগতিশীলদের কর্তব্য হল গত জানুয়ারি মার্চের গণআন্দোলনে জণগণের যে সকল আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ ঘটেছিল তার ভিত্তিতে একটি সংগ্রামের কর্মসূচি গ্রহণ করা অর্থাৎ সার্বিকভাবে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ ও বৃহৎ পুঁজির উৎখাত করে পূর্ববাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রথমত জনগণকে নির্বাচনের মোহ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত কেন্দ্রীয় কর্তব্য হিসেবে গ্রামাঞ্চলে সামন্তবাদ বিরোধী শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র ও জোরদার করতে হবে। তৃতীয়ত শহরাঞ্চলে পূর্ববাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক রূপ প্রদান করতে হবে। এই কর্তব্য সম্পাদনে অন্যতম মূল শর্ত হল জনগণকে সকল প্রকার বুর্জোয়া নেতৃত্বের মোহ থেকে মুক্ত করা। এই বিপ্লবী কৌশল গ্রহণ করলেই কেবলমাত্র সকল চক্রান্তকে প্রতিহত করে জনগণের মুক্তি সংগ্রামের কাফেলাকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

www.nagorikpathagar.org

সংস্কৃতি ও শ্রেণী সংগ্রাম

মানব সভ্যতার ইতিহাস মূলত শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। যেদিন থেকে মানব সমাজে শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে—সেদিন থেকে শ্রেণীসংগ্রামও চলছে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। আর এই সংগ্রামের কারণ আমরা খুঁজে পাই মানুষের পারস্পরিক অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্বে। শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে সমাজের সংস্কৃতির যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ধ্যান, ধারণা, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, ন্যায়-অন্যায়বোধ, সুন্দর-অসুন্দরের বিচার, আইন-কানুন ইত্যাদি সবকিছুকেই। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সংস্কৃতি কখনো শ্রেণী-নিরপেক্ষ হতে পারে না। প্রত্যেক শ্রেণীরই সংস্কৃতি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। প্রত্যেক শ্রেণীই তার নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টিতে জগৎকে রূপায়িত করতে চায়। এ দুয়ের মধ্যে কোনো সমন্বয় কিংবা বোঝাপড়া অসম্ভব ও অবাস্তব। শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে সংস্কৃতি একটি মূল্যবান হাতিয়ার। শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাব শ্রেণী শাসন ও শোষণকে বজায় রাখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শ্রেণীর সংস্কৃতি ও আদর্শের ভূমিকা কতখানি প্রত্যক্ষ। শিল্পীর স্বাধীনতা কিংবা স্বাধীনতা সম্পর্কে আমরা অনেক বক্তব্যই শুনে থাকি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে স্বাধীনতা কথাটা কখনো বিমূর্ত হতে পারে না। স্বাধীনতাও শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়। যেখানে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা রয়েছে সেখানে স্বভাবতই ধনিক শ্রেণীর স্বাধীনতা থাকতে পারে না—অপরপক্ষে যেখানে ধনিক শ্রেণীর স্বাধীনতা রয়েছে সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা থাকা অসম্ভব। শিল্পী ও চিন্তানায়করা কোনো না কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। শেক্সপিয়রকে বোঝাতে গিয়ে কডওয়েল তাই বলেছেন যে, এলিজাবেথের যুগে স্বাধিকার প্রমত্ত বাধাবন্ধনহীন, প্রাণচঞ্চল বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই শেক্সপিয়রের সাহিত্যের মূল উপজীব্য। শেক্সপীয়রের নায়ক তাই নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকামী রাজা যিনি রাজকীয় ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সমস্ত জগৎকে বড় করতে বেরিয়েছেন। বার্নাড শ সম্বন্ধে লেনিন একবার বলেছিলেন–"He is a great soul, alas! he has fallen among the Fabians." ফ্যাবিয়ানদের শ্রেণীচরিত্র কারুর অজানা থাকার কথা নয়।

সংস্কৃতির রূপরেখা কী রকম হবে তা নির্ভর করে সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনের ওপর তথা উৎপাদন শক্তিগুলোর বিকাশের পর্যায়ের ওপর। অপরদিকে সংস্কৃতি অর্থনৈতিক সংস্থার ওপর বিপুল প্রতিক্রিয়া বিস্তার করে থাকে। এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব এতই গভীর যে অনেক সময় তা উৎপাদন শক্তির বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সমাজের উর্ধ্বায়বয়ব ও মূলভিত্তি এই উভয়ের পরস্পর

www.nagorikpathagar.org

প্রতিক্রিয়াশীলতাই সমাজ প্রগতির কারণ। সমাজ বিকাশ সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গিই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদসম্মত। সমাজব্যবস্থায় যারা পরিবর্তন আনতে চান—তাঁরা যদি সংস্কৃতির ভূমিকাকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যবস্থার কথাই ভাবেন—তা হলে তারা যান্ত্রিক বস্তুবাদ কবলিত হবেন। এটা সমাজ বিকাশ সম্পর্কে একদেশদর্শী চিন্তা বই আর কিছু নয়।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখব শ্রেণী-সংগ্রামের জন্য সংস্কৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। প্রাচীন দাস-রাষ্ট্রে ধর্মের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, ইরান ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর জন্যও এ সমানভাবে সত্য। ধর্মের রীতি-নীতি উৎসব পূজা-অর্চনার স্বরূপের হয়তো পার্থক্য ছিল কিন্তু সকল ধর্মেরই সার কথা ছিল এক।

এ সব ধর্ম যা শিক্ষা দিত তার উদ্দেশ্য ছিল মেহনতি মানুষদের (দাসদের) সব সময় বংশবদ রাখা। ঈশ্বরের রুদ্ররোষের ভীতিই তাদেরকে অনুগত রাখত। এসব ধর্মীয় শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি বিত্তবান শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করলে নরকের শাস্তি ভোগ করতে হয় আর সকল প্রকার বঞ্চনা নীরবে সহ্য করে গেলে মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। যাজক শ্রেণীর লোকেরা সাধারণ মানুষকে বোঝাত যে বিত্তবান শ্রেণীর শাসনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। বিভিন্ন রাষ্ট্রে রাজার মূর্তিপূজার রেওয়াজ থেকে আমরা একথা বুঝতে পারি। বহু ঈশ্বরবাদ থেকে পর্যায়ক্রমে একেশ্বরবাদের উ ৎপত্তি। পৃথিবীতে রাজারা হলেন একেকজন দেবতা আর সকল দেবতার যিনি দেবতা তিনি হলেন ঈশ্বর। উৎপাদন শক্তির অনগ্রসরতার ফলে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে টিকে উঠতে পারত না—আর সেই সহায়হীন অবস্থাই মানুষের চেতনায় শোষকশ্রেণীর আদর্শ গভীর রেখাপাত করতে সাহায্য করেছিল।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উৎপীড়নের মাধ্যমেই সামন্তশ্রেণী নিজেদের শাসনক্ষমতা সুদৃঢ় করেছিল। কিন্তু আদর্শের জুলুমও ছিল মারাত্মক। সামন্তশ্রেণীর আদর্শের মাধ্যমে শোষণের মূলে ছিল ধর্ম আর গির্জার শক্তি। ক্যাথলিক ধর্মমত সামন্ত সমাজে শোষণের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ক্যাথলিসিজম রোমক সাম্রাজ্যে দাস-মালিকদের সরকারি ধর্মমতে পরিণত হয়। মধ্যযুগে সামন্তশ্রেণীর শাসকরা খ্রিষ্টধর্মের মধ্যে সমর্থন খুঁজে পায়। ক্যাথলিক গির্জাগুলো ছিল প্রভূত পরিমাণ জমির অধিকারী। সমগ্র ইউরোপে নেদারল্যান্ডের সেন্টট্রডের অ্যাবে ও প্যারিসের রটারডাম ক্যাথাড্রেল দুইটি বৃহত্তম সামন্ত ভূমি অধিকারী ছিল। এদের মালিকানায় ছিল কৃষি জমি, দ্রাক্ষাক্ষেত্র, বন এবং চারণভূমি। তা ছাড়া ধর্মযাজকরা কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ নিয়ে যেত। কৃষক আর কারিগর শ্রেণীকে সীমাহীনভাবে শোষণ করেই গির্জাগুলো সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল।

www.nagorikpathagar.org

সময়ের প্রবাহে ভাববাদী ও ধর্মীয় দর্শন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হল। নির্দয় উৎপীড়নের মধ্যেও সামন্ত সমাজে প্রগতিবাদী চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। আদর্শের সংগ্রাম প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে উঠল। ক্যাথলিক চিন্তাবিদরা বললেন এ্যারিষ্টটলের চিন্তাধারা ভ্রান্তিপূর্ণ। টমাস একিনার মতো ভাববাদী দার্শনিকদের দোহাই দিয়ে তারা মধ্যযুগীয় ধর্মের মূলনীতিগুলোর পেছনে যুক্তির সমর্থন যোগাতে তৎপর হয়ে উঠলেন। ঠিক একই সময়ে আরব দার্শনিকরা প্রাচীন বস্তুবাদ সমর্থন করতে লাগলেন; এর মধ্যে অ্যারিস্টটলের ধ্যান ধারণার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। এ সকল দার্শনিকদের মধ্যে ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইবনে রুশ্‌দ এর ধ্যান ধারণায় গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের প্রভাব দেখা যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রত্যেক পদার্থেরই মূর্ত পরমার্থ রয়েছে। সামাজিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকল ব্যক্তি মানুষের বুদ্ধির সমতাই ইবনে রুশদের দার্শনিক মতামতের অস্তিত্ববাচক দিক। পশ্চিম ইউরোপের প্রগতিবাদী দার্শনিকরা ইবনে রুশদের চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেন। ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে এই চিন্তাধারাকে খাপ খাইয়ে নেওয়াই ছিল তাঁদের কাজ। এমনিভাবে ইউরোপের চিন্তাজগতে এক নতুন স্রোত প্রবাহ বইতে লাগল। সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামে বস্তুবাদী আদর্শ তৎকালীন প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে দেখা দিল। ফরাসি দার্শনিক সিগার ব্রাবিন্‌সকি বস্তুবাদী চিন্তাধারার একজন অগ্রনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তিনি হলেন লাতিন ইবনে রুশ্‌দবাদের জনক। তাঁর মতবাদ সাম্যবাদ বিরোধী আদর্শের মৌলিক সূত্রগুলো সৃষ্টি করল।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে ইতালির নগরীগুলোতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ শুরু হল। সেইসঙ্গে আদর্শের ক্ষেত্রেও বইতে লাগল পরিবর্তনের হাওয়া। আবির্ভাব ঘটল নব্য বুর্জোয়া সংস্কৃতির। একেই ইউরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁ বলা হয়। এই নব উত্থিত শোষক শ্রেণীটির একটি স্বতন্ত্র বিশ্বদৃষ্টি ছিল। কারখানার মালিক, বণিক শ্রেণী এবং সুদখোররা সামন্ত প্রভুদের মতোই লোভী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। অধিকতর মুনাফা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা, তাদেরকে যে কোনো পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারত। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা প্রকৃতিজগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা তীব্রতর করে তুলল। কারিগরি প্রকৌশল ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ প্রভূতভাবে অগ্রসর হল। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে মানুষ এক নবদিগন্তের সন্ধান পেল। প্রকৃতিকে জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে বাধ্য করল ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করতে। পরীক্ষা না করে কোনো কিছুকেই এখন সে মেনে নিতে রাজি নয়। একটি নতুন বিশ্বদৃষ্টির বিকাশ ঘটল যুগের পরিপ্রেক্ষিতে, সেদিন এই বিশ্বদৃষ্টি ছিল খুবই প্রগতিশীল। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি রেনেসাঁ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, গাণিতিক এবং প্রকৌশলবিদ ছিলেন। শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মাইকেল এঞ্জেলো

www.nagorikpathagar.org

(১৪৭৫-১৫৬৪) আরেকটি অবিস্মরণীয় নাম। তা ছাড়া রাফায়েল ও তিতিয়ানের (১৪৭৭-১৫৭৬) চিত্রকলা, আরিওস্তোর (১৪৭৪-১৫৩৩) গদ্য ও পদ্য রচনাবলি এবং র‍্যাবিলিয়াস প্রমুখের অবদান বিশ্বসংস্কৃতির ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ।

আদর্শের ক্ষেত্রে এই নতুন গতিধারাকে মানবতাবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হল। মানবতাবাদ শব্দটি এই নব সংস্কৃতির ধর্মনিরপেক্ষ স্বরূপকে বোঝাবার জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে। বিকাশমান পুঁজিবাদী সমাজের প্রতিনিধি এই তথাকথিত মানবতাবাদীরা মূলত উৎকট ব্যক্তিবাদের ধারক ও বাহক। যে কোনো মূল্যে ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারই এর মূলকথা। এ প্রসঙ্গে মেকিয়াভেলির (১৪৬৯-১৫২৭) রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রণিধানযোগ্য। মেকিয়াভেলি রচিত গ্রন্থ "দি প্রিন্স" এ আমরা দেখতে পাই ব্যক্তিগত কিংবা শ্রেণীগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য যে কোনো পন্থাই নির্দ্বিধায় গ্রহণযোগ্য। বলপ্রয়োগ, ধূর্তামি, শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার কিংবা মোনাফেকি—যাই হোক না কেন। সুতরাং "বুর্জোয়া মানবতাবাদের" সঙ্গে "সর্বহারার মানবতাবাদের" কোনো সামঞ্জস্য থাকতে পারে না। সর্বহারারাই মানব-ইতিহাসে সবচাইতে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে থাকে। আদর্শের ক্ষেত্রে তাদের সংগ্রামের হাতিয়ার হল মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদ ও তাদের সংস্কৃতি হল সর্বহারার মহান সংস্কৃতি।

স্বাধীনতা উত্তরকালে '৪৭-এর পর পাকিস্তানের ঐতিহাসিক বিকাশের দিকে লক্ষ করলে আমরা সেই একই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারি। 'সংস্কৃতি শ্রেণীসংগ্রামের শক্ত হাতিয়ার'। স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের শাসনক্ষমতা চলে যায় পুঁজিপতি ও সামন্ত শ্রেণীর হাতে, তাও আবার অবাঙালি পুঁজিপতি ও সামন্তশ্রেণীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বে। ফলত বাঙালি পুঁজিপতিদের আশা আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশেই অপূর্ণ থেকে যায়। এই শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ ও পূর্ব বাংলার শোষিত জনগণের পুঞ্জিভূত ক্রোধই ভাষা আন্দোলনের বাস্তব ভিত্তি যুগিয়েছিল। ভাষার সঙ্গে সমগ্র বাঙালি সংস্কৃতির অস্তিত্বের প্রশ্নটি জড়িত। যে জাতির সংস্কৃতি বিকৃত হয়ে যায় সে জাতি নির্বীর্য ও ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। উপনিবেশবাদের যুগে সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশিক জাতিগুলোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিনষ্ট করেই তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রেখেছে যুগ যুগ ধরে। ঠিক একই কারণে বাঙালি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে বাঙালি সংস্কৃতি এক সুমহান প্রেরণার উৎস। শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্ব ভিন্ন সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় অসম্ভব। এখানকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শের হাতিয়ার মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগেই এ সংগ্রামের বিজয় সুনিশ্চিত হতে পারে। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের কারণ হল এর আপসহীন সাচ্চা বিপ্লবী চরিত্র।

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষার দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ

আমাদের জাতীয় জীবনে ভাষা, সংস্কৃতি, শাসনতান্ত্রিক কাঠামো, অর্থনৈতিক উৎপাদন, বণ্টন, পরিকল্পনা ও অন্যান্য বহুল বিতর্কিত প্রশ্নের মতো শিক্ষা সম্পর্কীয় বিতর্কের আজো সমাধান হয় নি। 'কাব্যের উপেক্ষিতার' উর্মিলার মতোই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও তদসম্পর্কিত সকল সমস্যাবলির প্রতি সামান্যতম মনোযোগ কিংবা উৎসাহ প্রদর্শন করা হয় নি। আমাদের জাতীয় শিক্ষার দর্শন কী হবে—এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়ে কেউবা ডিউইর মতো পশ্চিমা শিক্ষার পথিকৃৎদের দর্শনের আক্ষরিক প্রয়োগে কিংবা আধুনিক যুগের চাহিদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় মূল্যবোধের স্ফুরণেই দেখতে পেয়েছেন শিক্ষার সার্থকতা। তা ছাড়া এ সকল বিতর্কের গভীরে তলিয়ে গেছে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাটি। স্বাধীনতার বাইশ বছরেও আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা দর্শনকে বর্জন করে সুস্থ স্বাভাবিক জাতীয় ও মানবিক বিকাশের উপযোগী কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার রূপায়ণ করতে পারি নি। এই ব্যর্থতা ও বঞ্চনাবোধ আমাদের আক্ষেপের কারণ নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই আক্ষেপই আমাদের সমস্যার সমাধান দেবে না। সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের জানতে হবে সমস্যাগুলো মূলত কী কী—এসব সমস্যার বস্তুগত ভিত্তি কোথায়–কেননা সমস্যার উৎসমূলের সন্ধান না পেলে কখনোই সমস্যার জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়–সম্ভব নয় শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক রূপান্তর।

এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও গলদের দিকগুলো আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যা যা বলেছেন তার সঙ্গে লোকায়ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত বিশ্লেষণের সঙ্গে তেমন কোনো তফাৎ আবিষ্কার করা যাবে না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে লোকায়ত বিশ্লেষণ ও রাবীন্দ্রিক বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী আদর্শ–দুই বিশ্বদৃষ্টির প্রকাশ। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির যেসব গলদ কবিগুরুকে বারবার পীড়া দিয়েছে, তন্মধ্যে শিক্ষার অস্বাভাবিকতা ও আনন্দহীনতাই প্রধান। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অস্বাভাবিকতার উৎপত্তি তার আনন্দহীনতায়–আর আনন্দহীনতার কারণ মাতৃভাষা আজো শিক্ষার মাধ্যম নয়। নবজাতকের পরিপুষ্টি যেমনি মাতৃস্তন্যের ওপর নির্ভরশীল—ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীর মনের পুষ্টির জন্য চাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে হতে হয় পরিশ্রান্ত—বঞ্চিত হতে হয় শিক্ষণীয় বিষয়ের মূল রসসুধা থেকে। এতে মানসিক বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয় মনের জগতে বিকৃতি দেখা দেয়। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন না হওয়ার

www.nagorikpathagar.org

দরুন ছাত্রদের পক্ষে সৃজনশীল প্রয়াস গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে না–অথচ যে শিক্ষা সৃজনশীল মননের বিকাশ ঘটায় না–তা কখনোই সার্থক শিক্ষারূপে পরিগণিত হতে পারে না। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল মানুষের মধ্যেকার সৃজনশীল প্রবৃত্তিগুলোর স্ফুরণ–মনের পোড়ো জমিকে ফসল ফলানর মতো উপযোগী করে তোলাই সার্থক শিক্ষা-পদ্ধতির লক্ষ্য। কবি বলেছেন– "একতো ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা–শব্দবিন্যাস পদবিন্যাসের সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনো প্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয় প্রসঙ্গত বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়।"

বিদেশী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ার দরুন–শিক্ষা তথা আধুনিক জ্ঞান—বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণার ব্যাপক প্রসার ব্যাহত হচ্ছে। কবি বলেছেন, "বিদ্যা বিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি।" ফলত শিক্ষাদীক্ষা আজ আর সর্বসাধারণের সামগ্রী নয়–এটা আজ নাগরিক সভ্যতার একটা বিলাস মাত্র।

আইনকানুনের বেড়াজাল আর উপকরণ বহুলতা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম গলদ। বিশেষ করে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষায়তন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ব্যবস্থা রয়েছে তা সভ্য সমাজের জন্য চরমভাবে অশোভনীয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে বর্তমান সমাজ কাঠামোর সকল আইনই সুস্থ সামাজিক প্রগতির পরিপন্থী—সুতরাং এর সমুদয় অপসারণ আমাদের কাম্য। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে যে আইন বিরাজ করেছে তা শ্বাসরুদ্ধকর। শিক্ষাক্ষেত্রে আইনের বেড়াজাল সম্পর্কে কবিগুরুর অভিমত খুবই স্পষ্ট। কবি আইনকে অবজ্ঞা করতে চান না। কিন্তু আইনকে উপায় না করে লক্ষ্য করে তোলাতেই কবির আপত্তি। আইনকে অবজ্ঞা করলে শাস্তির বিধান রয়েছে–কিন্তু আইনের ভয়েই কেবলমাত্র যারা ভালো মানুষ তাদেরই কতখানি মূল্য দেওয়া যেতে পারে! সততা তখনই প্রশংসনীয় যখন তা সাহসিকতার প্রকাশ আর সততা যখন দুর্বলতারই নামান্তর তখন তা হীনতারই পরিচায়ক। "ছোট ছোট নিষেধের ডোরে" যে ভালো মানুষের সৃষ্টি–সে মানুষ জীবনবাদী হতে পারে না–সমস্যাসঙ্কুল মানবজীবনের ঘাত প্রতিঘাতে সে হয় পর্যুদস্ত, দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষম, জীবনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় অপারগ। শিক্ষাক্ষেত্রে আইন আর উপকরণের ঝকমারি করতে গিয়ে কী করে কচি কচি ছেলেগুলোর প্রাণের সজীবতা বিনষ্ট হয় কবির অনুপম রূপক গল্প "তোতাকাহিনী" তার চমৎকার নিদর্শন।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাপদ্ধতির যান্ত্রিকতা সম্পর্কে কবিগুরু একটা ভীষণ উপভোগ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন। "স্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি, সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই চার পাতা কলে ছাটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তাহার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া মার্কা পড়িয়া যায়।"

কবি বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর অতীব গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিজ্ঞান সাধনা ছাড়া আমাদের নিস্তার নেই। জড় দৈত্যকে হাত করেছে বলেই উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে এতখানি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। "বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ বিশ্বনিয়মকে সাধারণ নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করে আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পরে, আর কেউ না আর কিছুতে না। এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।" কবিগুরুর এই উক্তির পাশাপাশি চেয়ারম্যান মাও-সেতুং এর একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। Natural science is one of many weapons in his fight for freedom. For the purpose of attaining freedom in society, man must use social science to understand and change society and carry out social revolution. For the purpose attaining freedom in the world of nature, man must use natural science to understand, conquest and change nature and and thus attain freedom from nature."

বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিশ্বপ্রকৃতির নিজস্ব সূত্রগুলো আয়ত্বের প্রতি উভয় দার্শনিকই গুরুত্ব আরোপ করেছেন সত্য, কিন্তু উভয়ের দর্শনের ভিত্তিমূল সম্পূর্ণ পৃথক। কবিগুরু মনে করেন বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম বিধিপ্রদত্ত আর মাও-সেতুং মনে করেন বিশ্বপ্রকৃতিটাই একটা বিধি—আলাদা কোনো অলৌকিক বিধির তিনি সন্ধান করেন না। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন বর্জিত জ্ঞানসাধনার প্রতি কবিগুরু বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন অনেকবার। "প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংশ্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে। অতএব আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে এই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।"

www.nagorikpathagar.org

রাশিয়া ভ্রমণের পর কবির জনশিক্ষা বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হয়েছে। জনশিক্ষা ব্যতীত যে দেশের মুক্তি সম্ভব না—একথা তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছেন। রাশিয়ার চিঠির প্রায় জায়গাতেই এই শিক্ষার প্রতি বেদনা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "রাশিয়ার চিঠি প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের শিক্ষার অভাব ও ত্রুটির জন্য আক্ষেপ মাত্র।" রাশিয়া যাওয়ার আগে কবি বিশ্বাস করতেন না যে 'সভ্যতার পিলসুজ' তথা সাধারণ ও নিম্নস্তরের মানুষদের শিক্ষার আলোক দেওয়া যায়। মহান লেনিন স্তালিনের দেশ সোভিয়েত রাশিয়ায় গিয়ে কবি এ সত্যটিকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

পাক-ভারত উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও গলদগুলো রবীন্দ্রনাথের চেতনায় বারবার নাড়া দিয়েছে। তিনি অনেকবারই এর পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে অনেক কিছু লিখেছেন। কিছু পরিবর্তন তিনি কামনা করেছেন এমন এক পথে যাতে আদৌ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা সম্ভব হত না। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা কবিকে আকৃষ্ট করেছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষাকেই তিনি আদর্শ শিক্ষা হিসেবে মনে করতেন। সেই ধরনের একটা ব্যবস্থা তিনি কার্যকর করতে চেয়েছেন "শান্তিনিকেতন" ও বিশ্বভারতীতে। প্রাচীন সমাজের প্রতি আকর্ষণ কবির রক্ষণশীল মানসিকতারই প্রকাশ। কবিগুরু আজ আর বেঁচে নেই। গণচীনে নতুন সমাজে নতুন মানুষ সৃষ্টির জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার এক মহাপ্রয়াস চলছে। তত্ত্বের সঙ্গে অনুশীলনের, চিন্তার সঙ্গে কর্মের, ব্যাপকতার সঙ্গে বিশিষ্টতার, সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সমাজচেতনার, সময়ের সঙ্গে সঙ্গতির, গুণগত উৎকর্ষের সঙ্গে পরিমাণগত চাহিদার মিলন ঘটানোর মধ্য দিয়ে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে। কবিগুরু আজ যদি চীন ভ্রমণে যেতেন তা হলে হয়তো এ যুগের নতুন তীর্থ দেখতে পেতেন।

www.nagorikpathagar.org

রাজনীতি-শিল্প : গণ-অভ্যুত্থান

লেনিনের ভাষায়, "যেখানেই জনসাধারণ, সেখানেই রাজনীতির আরম্ভ, আর সেখানে, কেবল কয়েক হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের বাস, সেখান থেকেই আরম্ভ হয় অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতি।"

অধ্যাপক ই. এইচ. কার লিখেছেন, "কার্লাইল ও লেনিনের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছিল লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্যক্তি, কোনো ক্রমেই তাহারা পরিচয়হীন নহে; তাহাদের নাম আমাদের জানা নাই বলিয়াই তাহাদের ব্যক্তি পরিচয় লোপ পায় না।...এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নামহীনেরা সক্রিয় ও অল্পবিস্তর সচেতন। আর ইহারাই সমবেতভাবে একটা বিপুল সামাজিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়।" (E. H. Carrl: What is History? P. 64)

বায়ুমণ্ডলে কোথাও চাপের ভারসাম্যহীনতা ঘটলে বিশাল ঝঞ্ঝা প্রবাহ যেমনি মহাসমুদ্রের জলরাশিকে উত্তালতরঙ্গে মাতিয়ে তোলে, তেমনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় ভারসাম্যহীনতা দেখা দিলে সমাজের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নাম না জানা সদস্যরা সর্বাত্মক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে মেতে ওঠে–আমরা তখন বলি 'জনতা সাগরে জেগেছে উর্মি'—গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল জোয়ারের সূচনা হয়। লেনিনের ভাষায় এই উত্তাল তরঙ্গের সূচনা হল 'অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতির' সূচনা। কোটি কোটি জনগণ যখন অনুভব করতে শুরু করে, প্রচলিত ব্যবস্থায় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়—তখনই সমাজে বিপ্লব দেখা দেয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বাধ্য না করলে মানুষ কখনো বিপ্লবের পথে যায় না। যেমনিভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো মানুষই নিরর্থক রক্তপাত ও হানাহানিতে লিপ্ত হয় না। মানব প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিকরা নানা বিতর্ক বিভিন্ন সময়ে করেছেন। একদল দার্শনিক মনে করেন, মানুষ স্বভাবজাতভাবেই কলহপ্রিয়। সুতরাং এই কলহপ্রিয় মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও সমাজে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যই সমাজে রাষ্ট্রযন্ত্র তথা শাসনব্যবস্থা স্থাপন অপরিহার্য। অপরদিকে প্রগতিবাদী দার্শনিকদের মতে মানুষ সহজাতভাবেই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু এই শান্তিপ্রিয় মানুষকেই যুগে যুগে ব্যবহার করেছে সমাজের মুষ্টিমেয় স্বার্থপর গোষ্ঠী মারণাস্ত্রের খোরাক হিসেবে। নিপীড়ক শ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধির কাছে বন্দি মানুষ কেবল জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যই সংগ্রাম করে চলেছে। এই বন্দিদশা থেকে মুক্তি অর্জন ব্যতিরেকে মানুষের কোনো স্বাধীন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখার এই সংগ্রামী প্রয়াসই দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী প্রক্রিয়ারই অংশ। পর্বতের শীর্ষদেশ যেমনি পর্বতমালার মধ্যে 'সুউচ্চ শিলার স্তূপ' অভ্যুত্থান তেমনি বিশাল বিপ্লবী প্রক্রিয়ার শিখর চূড়া। চূড়ান্ত আঘাত হানার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জনগণ বেশ কয়েকবার আগুপিছু করে। চূড়ান্ত আঘাত হানার কাজটাই হল অভ্যুত্থান।

www.nagorikpathagar.org

সাধারণ অর্থে অভ্যুত্থান ও ষড়যন্ত্রে রয়েছে বিরাট প্রভেদ। অভ্যুত্থান ব্যাপক জনতার স্বতঃস্ফূর্ত কাজ আর ষড়যন্ত্র সংখ্যালঘিষ্ঠের পূর্ব পরিকল্পিত প্রয়াস। চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের সঙ্গে একটি সফল অভ্যুত্থানের বিরাট প্রভেদ রয়েছে। একটি শ্রেণী গোটা জাতির নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েই কেবলমাত্র অভ্যুত্থান পরিচালিত করতে পারে। অপরদিকে ষড়যন্ত্রীরা নিজেদের গোটা জনতার কাছ থেকে গোপন রাখে।

প্রত্যেক শ্রেণী সমাজেই এমন সব ফাটল থাকে যাতে করে ষড়যন্ত্র দানা বাঁধতে পারে। সমাজ-জীবন ব্যাধিগ্রস্ত না হলে ষড়যন্ত্রের রাজনীতি প্রাণরস সংগ্রহ করতে পারে না। একটি নির্জলা ষড়যন্ত্র যদি জয়লাভ করে তাতে পুরোনো শাসকশ্রেণীরই নতুন একটি গোষ্ঠী ক্ষমতাসীন হয়; কিংবা শাসক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়। কেবলমাত্র গণ-অভ্যুত্থানের পথেই পুরোনো সামাজিক শাসনের পরিবর্তে নতুন সামাজিক শাসন আসতে পারে। মাঝে মাঝে সমাজে যেসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ঘটে–তা সামাজিক জড়তা ও ক্ষয়িষ্ণুতারই প্রতীক। অপরদিকে গণ-অভ্যুত্থান আসে এমন এক সময়ে যখন পুরোনো সামাজিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ে---সমাজ একটা পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠে।

ষড়যন্ত্র ও গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে এই দুস্তর পার্থক্যের অর্থ এই নয় যে, ষড়যন্ত্র ও অভ্যুত্থান সকল অবস্থাতেই পরস্পর বিযুক্ত। সকল গণ-অভ্যুত্থানেই কিয়ৎ পরিমাণে ষড়যন্ত্রের উপাদান থাকে। ঐতিহাসিক বিকাশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজ-বিপ্লবের বিশেষ স্তরে একটি গণ-অভ্যুত্থান কখনই নির্জলা স্বতঃস্ফূর্ততার দ্বারা সংগঠিত হতে পারে না। পাখি যেমনি তার ডিমকে 'তা' দিয়ে শাবকের জন্ম দেয়, তেমনি অভ্যুত্থানকারীরা তাদের মতবাদের মাধ্যমে সমাজ জীবনে এমন এক উত্তাপ সৃষ্টি করে— যা সমাজকে অভ্যুত্থানের পথে নিয়ে যায়। এই মতবাদের মাধ্যমেই অভ্যুত্থানকারীরা জনগণকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পথপ্রদর্শন করে। পূর্বাহ্নেই গণ-অভ্যুত্থানের পূর্বাভাষ ঘোষণা করা ও একে সংগঠিত করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব। এমতাবস্থায় ষড়যন্ত্র হয় গণ-অভ্যুত্থানের অধীন—এই ষড়যন্ত্র অভ্যুত্থানের পথকে মসৃণ করে এবং এর বিজয়কে করে ত্বরান্বিত। বিপ্লবী আন্দোলনের রাজনৈতিক মান যতই উন্নত হবে; এর নেতৃত্ব যতই গভীরতা সম্পন্ন হবে, সেই গণ-অভ্যুত্থানে ষড়যন্ত্র তত পরিমাণে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

ষড়যন্ত্র ও গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক নিরূপণ করা দরকার। কেননা, এই উভয়ের মধ্যে যেমনি রয়েছে বৈরী সম্পর্ক, তেমনি রয়েছে পরস্পরসম্পূরক সম্পর্ক। ষড়যন্ত্র শব্দটিই দ্ব্যর্থবোধক। কখনো কখনো ষড়যন্ত্র বলতে বোঝায় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বাধীন উদ্যোগ, আবার কখনো বোঝায় ব্যাপক জনতার অভ্যুত্থানের জন্য মুষ্টিমেয়গোষ্ঠীর প্রস্তুতি।

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাসে এই দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে, বিশেষ অবস্থায় ষড়যন্ত্র ব্যতিরেকেই গণ-অভ্যুত্থান সফল হতে পারে। সর্বজনীন অসন্তোষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উত্থিত-বিক্ষিপ্ত প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, ধর্মঘট, পথে পথে খণ্ড লড়াইয়ের মাধ্যমে গণ-অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীর একাংশকে নিজ পক্ষে টেনে নিয়ে আসতে পারে–রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করে দিতে পারে এবং পুরোনো ক্ষমতাসীনদের উৎখাত করতে পারে। ১৯১৭ সালের রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে অনেকটা তাই ঘটেছিল। ১৯১৮ সালের হেমন্তে জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয় অভ্যুত্থানে অনেকটা সেই ধরনের একটা কিছু ঘটেছিল। যেহেতু এইসব অভ্যুত্থানে এমন কোনো পার্টির নেতৃত্ব ছিল না—অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ও স্বার্থই যার স্বার্থ, সেইহেতু এইসব অভ্যুত্থানের সফল পরিণতিতে সেইসব দলের হাতেই ক্ষমতা গিয়েছে–যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এর বিরোধিতা করেছে। আমাদেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতার সুযোগ হয়েছে। ১৯৭১-এর মার্চ গণঅভ্যুত্থানে বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্ব না থাকার পরিণতিতে পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসীদেরই বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সুযোগ দিয়েছে।

পুরোনো শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটান এক কথা আর ক্ষমতার হাত বদল সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। একটি গণ-অভ্যুত্থানে ধনিক শ্রেণী জয়ী হয়–তা এইজন্য নয় যে, সে বিপ্লবী বরং সে ধনিক শ্রেণীভুক্ত। ধনিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে থাকে ধন-সম্পদ, শিক্ষা, প্রচার মাধ্যম ও গুরুত্বপূর্ণ 'প্রশাসন' কাঠামোয় অধিষ্ঠিত আমলারা। অপরদিকে সর্বহারা শ্রেণী এইসব সামাজিক সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত। বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণীকে কেবলমাত্র তার সংখ্যা, সংহতি ও একতা, কর্মীদের মান ও তার সংগঠনের ওপর নির্ভর করতে হয়।

একজন কর্মকার যেমনি আগুনে পোড়া লাল টুকটুকে লৌহখণ্ড খালি হাতে আঁকড়ে ধরতে পারে না–তেমনিভাবে সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষেও সরাসরি ক্ষমতা দখল সম্ভব নয়। ক্ষমতা দখলের জন্য তার থাকতে হবে উপযুক্ত সংগঠন। মার্ক্স এবং এঙ্গেলস্ 'অভ্যুত্থানের শিল্পকলা' বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন? গণ-অভ্যুত্থানও ষড়যন্ত্রের সমন্বয়সাধন, ষড়যন্ত্রকে অভ্যুত্থানের অধীনস্তকরণ, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অভ্যুত্থানকে সংগঠিত করা—সবই এই শিল্পকলার অন্তর্গত। আবার এসবের পূর্বশর্ত হল–জনগণের সার্বিক সঠিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা, পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নমনীয় কৌশল গ্রহণ, আঘাত হানার জন্য সার্বিক পরিকল্পনা, প্রকৌশলগত প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন এবং সর্বশেষে দুঃসাহসিক আঘাত হানার কাজটি।

গণ-অভ্যুত্থান হল একধরনের শিল্প-কলা এবং সকল প্রকার শিল্পকলার মতোই এর রয়েছে নিজস্ব রীতি। ফরাসি ইউরোপীয় সমাজবাদী ব্লাঁকির মতে, রণকৌশলগত সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলেই অভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে। তার এই ধারণাটা হয়েছিল একটা উল্টো চিন্তা থেকে—অর্থাৎ রণকৌশলগত ব্যর্থতা অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা বয়ে আনে। এখানেই হল ব্লাঁকির মতোবাদের সঙ্গে মার্কস্‌বাদী মতবাদের পার্থক্য। সর্বহারাদের সংখ্যালঘিষ্ঠ সক্রিয় একটা গোষ্ঠী কখনোই দেশের সার্বিক

www.nagorikpathagar.org

অবস্থাকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে না–অর্থাৎ কেবলমাত্র রণকৌশলের নিপুণতাই সাফল্য আনতে পারে না। ঐতিহাসিকভাবে ব্লাঁকিবাদের ব্যর্থতা এখানেই। ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বহারাদের নির্ভর করতে হয় স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের চাইতেও অনেক বেশি কিছুর ওপর। ক্ষমতা দখলের জন্য সর্বহারাদের প্রয়োজন সংগঠনের, প্রয়োজন পরিকল্পনার, প্রয়োজন ষড়যন্ত্রের।

সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের অভিজ্ঞতা বলে—যেই সংগঠনের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণী পুরোনো শাসকগোষ্ঠীকে উৎখাত করে নতুন ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে তা হল–'সোভিয়েত'। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত 'সোভিয়েতের' মাধ্যমে সর্বহারাদের ক্ষমতা দখলের বিষয়টি ছিল চিন্তার জগতে। অবশ্য এই চিন্তার প্রাথমিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের জার বিরোধী অভ্যুত্থানে। 'সোভিয়েত' হল গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত করার জন্য প্রস্তুতিমূলক সংগঠন–আর অভ্যুত্থানের বিজয়ের পর সোভিয়েতগুলো হল সর্বহারাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সংগঠন। কিন্তু কেবলমাত্র 'সোভিয়েত' সংগঠনই সর্বহারাদের ক্ষমতা দখলের সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সর্বহারাদের বিপ্লবী পার্টিই সোভিয়েতকে কর্মসূচি প্রদান করে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল তখনি সম্ভব হয় যখন এই বিপ্লবী পার্টির সঙ্গে সোভিয়েতের সমন্বয় ঘটে। অথবা সোভিয়েতের বিকল্প হিসেবে এমন সব গণ-সংগঠন যা সোভিয়েতের মতোই কাজ করে।

বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সুবর্ণ সময়েই 'সোভিয়েত' ক্ষমতা দখলের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতি রেখে এবং জনগণের মানসিকতার দিকে দৃষ্টি রেখেই সোভিয়েত অভ্যুত্থানের সামরিক ভিত্তি রচনা করে। শত্রুর ওপর অতর্কিতে আঘাত হানার জন্য সামরিক স্কোয়ার্ডগুলোকে একটা সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়—এবং চূড়ান্ত আঘাত ও আক্রমণের রূপরেখা তৈরি করতে হয়—একেই বলে সংগঠিত ষড়যন্ত্রের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের রূপ প্রদান।

অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে বলশেভিকরা অনেকবার শত্রুপক্ষের তরফ থেকে উত্থাপিত ষড়যন্ত্রবাদ ও ব্লাঁকিবাদের অভিযোগ খণ্ডন করেছে। সর্বোপরি নিছক ষড়যন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে লেনিনই সর্বাধিক কঠোর সংগ্রাম চালিয়েছেন। বলশেভিকরা ব্যক্তিসন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে বহু আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। নানা বর্ণের ব্লাঁকিবাদ ও নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে লেনিন এক মুহূর্তের জন্যও জনগণের নির্জলা স্বতঃস্ফূর্ততার নিকট নতি স্বীকার করেন নি। বিপ্লবের জন্য বাস্তব পরিস্থিতি ও বিষয়বাদী প্রস্তুতির ওপর যুগপৎ তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রামের সঙ্গে পার্টির পলিসির সম্পর্ক, সাধারণ জনগণ ও প্রগতিশীল সচেতন শ্রেণীর সম্পর্ক, সর্বহারা শ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনীর সম্পর্ক, পার্টি ও সোভিয়েতের সম্পর্ক এবং অভ্যুত্থান ও ষড়যন্ত্রের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে লেনিনের ছিল একটা পরিষ্কার ধারণা।

www.nagorikpathagar.org

একথা যেমনি সত্য যে ইচ্ছা করলেই একটা গণ-অভ্যুত্থান ঘটান যায় না—কিন্তু অভ্যুত্থানে সাফল্য লাভের জন্য অভ্যুত্থানের সময় আসার পূর্বেই সাংগঠনিক প্রস্তুতি দরকার। বিপ্লবী নেতৃত্বকে অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা নিরূপণ করতে হয়। বিস্ফোরণ ঘটার বেশ কিছু আগেই নেতৃত্বকে বুঝতে হবে বিস্ফোরণের সময় ঘনিয়ে আসছে এবং অভ্যুত্থানকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় ষড়যন্ত্রমূলক প্রস্তুতিও সম্পন্ন করে নিতে হবে। প্রসূতির প্রসব-বেদনা শুরু হলে ধাত্রীকে যেসব কাজ সম্পন্ন করে নিতে হয়—বিপ্লবী নেতৃত্বকেও গণ-অভ্যুত্থানের বিস্ফোরণ ঘটার আগেই সেসব কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

গণ-অভ্যুত্থানের জন্য সময় নির্ধারণের প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এমন একসময়ে অভ্যুত্থানের আহ্বান জানাতে হবে, যখন অভ্যুত্থানের সূচনা ঘটালে অভ্যুত্থান ব্যর্থ হবে না। এসব কাজের জন্য এমন একটা সময় আসে, যা সপ্তাহ কিংবা মাসের হিসেবে নির্ণয় করা যায়। এই সময় আসার আগেই অভ্যুত্থানের ডাক যেমনি সফল হয় না—সময় চলে যাবার পরও অভ্যুত্থানের ডাক তেমনি সফল হয় না। কিন্তু এই সময়সীমার পরও থাকে সুনির্দিষ্ট দিন ক্ষণের প্রশ্নটি অর্থাৎ শেষ আঘাত হানার বিষয়টি—যা একান্তই বিপ্লবী নেতৃত্বের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিরূপণ করবার বিষয়। বলা যেতে পারে, এই দিনক্ষণ নির্ণয়ের সমস্যা-সকল সমস্যার কেন্দ্রীয় সমস্যা—কারণ, এই প্রশ্নেই এসে সমন্বিত হয় বিপ্লবের নীতি ও অভ্যুত্থানের কৌশল। এক কথায় বলা যায়, অভ্যুত্থান হল রাজনীতিরই ধারাবাহিকতা-যে রাজনীতিতে হাতিয়ার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সকল প্রকার সৃজনীকলার মতো বিপ্লবী নেতৃত্বের থাকতে হবে অভিজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। আর তা কাজ চালিয়ে নেবার প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই থাকতে হয়। জাদুকররাও অভিজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু রাজনীতির জাদুতে যুগ ও সময়ের পরিপ্রেক্ষিতটাও বিচার করতে হয়। জাদুকরের জন্যে সময়ের বালাই নেই। একই জাদু সময় নির্বিশেষে সে দেখাতে সক্ষম। কিন্তু রাজনীতির জাদুকরদের বিচার করতে হয় আলোড়ন, অভ্যুত্থান ও উপপ্লবের সময়টি কীভাবে ঘনিয়ে আসছে-আর এই অভ্যুত্থানও উপপ্লবের প্রেক্ষাপটে কোন কোন ঐতিহাসিক শক্তি বিরাজ করছে। নিরূপণ করতে হয়, প্রতিটি স্লোগান ও কর্মসূচির ফলশ্রুতিতে কোন কোন সামাজিক শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠছে।

বিপ্লবের প্রাথমিক শর্তই হল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা জাতির জরুরি সমস্যাসমূহ সমাধানে অক্ষম। সমাজে তখনি বিপ্লব সম্ভব হয়-যখন এসব জরুরি সমস্যাদি সমাধানে সক্ষম শ্রেণী সমাজে বিকশিত হয়। জনগণকে সচেতন সংগঠিত করে নতুন সামাজিক বিন্যাস রচনাতেই নিহিত থাকে বিপ্লবের প্রস্তুতিমূলক অধ্যায়।

www.nagorikpathagar.org

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যাবলি

এ যুগ সমাজতন্ত্রের যুগ-ধনবাদের শেষ সঙ্কটের যুগ। সাম্রাজ্যবাদের মুমূর্ষুদশায় বর্তমান বিশ্বে দুটি শিবিরের মধ্যে দ্বন্দ্ব স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। এক শিবিরে রয়েছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ; অন্যদিকে রয়েছে মুক্তি অর্জনের মহান ব্রত পালনে আগ্রহী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে নিয়োজিত কোটি কোটি নিপীড়িত জনতা। আজকের পৃথিবীর প্রধানতম দ্বন্দ্বটিও তাই—বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ এবং পৃথিবীর নিপীড়িত জনতা ও জাতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব—সে দ্বন্দ্বের অবসানের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে এক শোষণমুক্ত নতুন সমাজব্যবস্থা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীব্যাপী সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পালা শুরু হয়েছে—অতীতের কোনো ঐতিহাসিক যুগের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। আমরা ভাগ্যবান, আমরা জন্মেছি এই মহান পরিবর্তনের পালা প্রত্যক্ষ করার জন্য। মাও সে তুং বলেন, 'আজ থেকে শুরু করে আগামী পঞ্চাশ থেকে এক শ বছর হবে দুনিয়াব্যাপী সমাজ-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের এক মহান যুগ—একটি দুনিয়া কাঁপানো যুগ—যার অতীতের কোনো ঐতিহাসিক সময়ের সঙ্গে তুলনা হতে পারে না। এমন একটি যুগে বাস করে আমাদের অবশ্যই মহান সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে—যার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য হবে অতীতের সঙ্গে ভিন্নতর।' পরিবর্তন যতই অত্যাসন্ন, বিপ্লব যতই অবশ্যম্ভাবী, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্কট ততই গভীর হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমস্যাবলি ততই তীব্র স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করছে। প্রতিক্রিয়ার শক্তি প্রগতির শক্তির কাছে যতই আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত হচ্ছে ততই প্রতিক্রিয়ার শক্তি টিকে থাকার জন্যে নবতর ও সূক্ষ্মতর কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করছে-আদর্শগত ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিভ্রান্তির ধূম্রজাল রচনা করছে। এরই ফলশ্রুতিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে কোনো কিছু বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না। প্রত্যেকটি ঘটনা পরস্পর নির্ভরশীল ও পরস্পর সম্পর্কিত। কোনো সমাজব্যবস্থাকেই কিংবা সামাজিক আন্দোলনকে আমরা শাশ্বত ন্যায় হিসেবে ধরে নিতে পারি না। যে সব ঘটনা ঐ সমাজব্যবস্থা বা আন্দোলনকে সৃষ্টি করেছে ও যে সব ঘটনার সঙ্গে ঐ সমাজব্যবস্থা বা আন্দোলনের সম্পর্ক রয়েছে সেইসব ঘটনার পটভূমিকাতেই কোনো বিশেষ সমাজব্যবস্থা বা সামাজিক আন্দোলনকে বিচার করতে হবে। আজকের যুগে দাসপ্রথা বর্বর এবং অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু দাসপ্রথা আদিম গোষ্ঠী সমাজ ভাঙনের ক্ষেত্রে ছিল প্রগতিশীল। সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার যুগে ধনতন্ত্র ছিল একটি প্রগতিশীল ও সৃজনশীল প্রয়াস।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেক জিনিসই স্থান, কাল ও পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। একথা স্পষ্ট যে, সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে এই ধরনের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে ইতিহাস বিজ্ঞানের অস্তিত্ব ও বিকাশ অসম্ভব। আমরা যদি একথা বুঝতে সক্ষম হই যে, বিশ্বপ্রকৃতি একটি সফল ও বিকাশমান প্রক্রিয়া ও পুরাতনের তিরোভাব এবং নতুনের আবির্ভাব তার স্বাভাবিক নিয়ম, তা হলে একথা বুঝতে কষ্ট হবে না যে, কোনো সমাজব্যবস্থাই শাশ্বত বা চিরন্তন নয়। কাজেই একদিন যেমন সামন্ত প্রথার স্থান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দখল করেছিল আজ তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জায়গায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব। স্বাভাবিকভাবেই ধনতন্ত্রের সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে এই ঐতিহাসিক নিয়মের অজুহাত টেনে আজকের বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছে। ধনতন্ত্র ক্রমশই সমাজতন্ত্রে পরিণত হবে এই বক্তব্য হাজির করে বিপ্লবী বল-প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করছে একশ্রেণীর সমাজতন্ত্রের ভেকধারী বুর্জোয়া শ্রেণীর সুচতুর দালালগোষ্ঠী। কার্লমার্ক্স বলেছেন, 'প্রতিটি পুরাতন সমাজের গর্ভে যখন নতুন সমাজের উদ্ভব হয়, শক্তি তখন ধাত্রী হিসেবে কাজ করে।'সামাজিক বিপ্লবসাধনে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা যুগে যুগে নতুন সমাজের আগমনী বার্তা বহনকারী দার্শনিকেরা স্বীকার করেছেন। স্মরণাতীতকাল থেকে বিভিন্নমত ও আদর্শের দার্শনিকেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ন্যায্যতা স্বীকার করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকেরাও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। এমনি একজন দার্শনিকের মতে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত, 'রাজার চাইতেও শক্তিশালী, অনেক সূত্রে গ্রথিত রজ্জুও একটি সিংহকে টেনে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট।' গ্রিসের নগররাষ্ট্রে ও প্রাচীন প্রজাতন্ত্রী রোমে অত্যাচারীদের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে খতম করার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করা হত। জন সেলিসবেরি তাঁর Book of Statesman-এ বলেছেন, 'যে রাজা আইনের মাধ্যমে শাসন করে না এবং অত্যাচারীরূপে অধঃপতিত হয় তাকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উৎখাত করা যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত।' মার্টিন লুথার বলেছেন, 'যখন একটি সরকার অত্যাচারীতে পরিণত হয় ও ন্যায়ের শাসনকে অস্বীকার করে তখন প্রজাদেরও একে মানার কোনো দায়িত্ব থাকে না।' আঠার শতকের ইংল্যান্ডে প্রথম চার্লস ও দ্বিতীয় জেমসকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই। এর পাশাপাশি উদারনৈতিক রাজনৈতিক দর্শনের বিকাশ হয়েছিল। এই দর্শন ছিল সমাজে নবোদ্ভূত সামাজিক শ্রেণীর আদর্শগত ভিত্তি। সেই শ্রেণী সামন্তবাদের বন্ধন ছিন্ন করে নতুন সমাজ গড়ার জন্যে সংগ্রাম করেছিল। ১৭৭৫ সালে আমেরিকারর বিপ্লব ও ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব প্রচণ্ড বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। মানবাধিকারে ফরাসি ঘোষণায় বলা হয়েছে–'যখন সরকার জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করে বিদ্রোহই তখন তাদের

www.nagorikpathagar.org

পবিত্রতম অধিকার এবং অবশ্য করণীয় কর্তব্য। যখন একব্যক্তি সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেয় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটাই স্বাধীন মানুষের কর্তব্য।' বিপ্লবী বল প্রয়োগই নতুন সমাজের ধাত্রী-ইতিহাসের এই অমোঘ সত্যকে বিকৃত করার জন্যে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে একশ্রেণীর পুঁজিবাদী চরেরা উঠে পড়ে লেগেছে। মার্ক্সবাদী পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় "আধুনিক সংশোধনবাদী'। চিলির আয়েন্দে সরকারের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এরা বলতে শুরু করেছিল শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এরা অজুহাত দেখাত চিলির দীর্ঘ তিরিশ বছরের নিয়মতান্ত্রিক ঐতিহ্যের। এরা আরো বলত 'শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক' সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকতে কোনো বিপর্যয়ের সম্ভাবনা নেই। অথচ এইসব সংশোধনবাদীরা বিস্মৃত হয়েছেন মহান লেনিনের শিক্ষা। লেনিনের মতে, সকল রাষ্ট্রেরই একটা শ্রেণী চরিত্র থাকে। একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থকে পাহারা দেবার জন্যেই রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলা হয়। সুতরাং বুর্জোয়া রাষ্ট্রতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর সরকার প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। প্রতিষ্ঠিত করা যায় না জনতার রাষ্ট্র, যদি না সাম্রাজ্যবাদীদের ঘৃণ্য অনুচর পরনির্ভরশীল বুর্জোয়া ও সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতার মূলস্তম্ভ সামরিক বাহিনীকে ধুলায় মিশিয়ে দিতে পারা যায়। আলেন্দে সরকারের বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে শতবর্ষ আগে প্যারি কমিউনে অজস্র রক্তের বিনিময়ে পাওয়া শিক্ষার সত্যতা আরেকবার প্রমাণিত হল। প্যারি কমিউন সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'কমিউন বিশেষভাবে একটি বিষয় দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণী আগেকার তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেবল করায়ত্ত করেই তার নিজের উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে না।' শ্রমিকশ্রেণীকে আগেকার তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে শুধু দখল করেই ক্ষান্ত থাকলে চলবে না, শ্রমিক শ্রেণীকে ঐ যন্ত্রটিকে ভেঙে চুরমার করতে হবে, আর ওর জায়গায় স্থাপন করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র যন্ত্র যা অবশেষে আবিষ্কৃত হল কমিউনে। প্যারি কমিউনের প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্রের বিয়োগান্ত পরিণতি থেকে মার্ক্স এঙ্গেলস-এর শিক্ষা ও রাষ্ট্র সম্পর্কে লেনিনের বাস্তব বিশ্লেষণকে মার্ক্সবাদী প্রেসিডেন্ট আলেন্দে পাল্টে দিতে চেয়েছিলেন তাই যা ঘটা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল ১১ই সেপ্টেম্বর। ১৯৭০ সালে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়ে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র করে তাক লাগিয়ে দেবেন বিশ্বজনগণকে এই কথাই ভেবেছিলেন আয়েন্দে, কিন্তু তাঁর আশাকে ব্যর্থ করে দিল দক্ষিণপন্থী সামরিক বাহিনী তাঁকে উৎখাত করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের রাজনীতি আইদিত ও আয়েন্দেকে প্রভাবিত করলেও সাম্রাজ্যবাদ কেন বারবার প্রতিবিপ্লবী হামলা চালায়? সাম্রাজ্যবাদের মূল লক্ষ্য আধিপত্য, শোষণ ও লুণ্ঠন। সেখানে ব্যাঘাত ঘটলেই সাম্রাজ্যবাদ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আয়েন্দে এমন কতকগুলো অর্থনৈতিক সংস্কারে হাত দিয়েছিলেন যা সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করত। তিনি চেয়েছিলেন চিলিকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে

www.nagorikpathagar.org

মুক্ত করতে। কিন্তু তাঁর পথ মোটেই বাস্তবধর্মী ছিল না। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা কখনো গৌতম বুদ্ধ হবে না। এমন খুনিরা কখনোই তাদের কসাই-এর ছুরিকা পরিত্যাগ করবে না। সুতরাং বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ একটি মরীচিকা মাত্র। মেক্সিকোর Excelsior পত্রিকার নিকট এক সাক্ষাৎকারে আয়েন্দের স্ত্রী মাদাম আলেন্দে বলেছেন, 'এটা প্রমাণিত হল ভোট বা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলই যথেষ্ট নয়। নির্বাচনে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও জনগণকে সশস্ত্র করা উচিত ছিল অথবা তাদের সেবায় একটি বাহিনী থাকা উচিত ছিল।"

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র চিলির ক্ষেত্রেই অবহেলিত হয় নি। ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতাকে আমল না দেওয়ার ফলে সুহার্তোর মতো সামরিক ফ্যাসিস্টের পক্ষে সম্ভব হয়েছে লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্টের রক্তে অবগাহন করা। প্যারি কমিউন সম্পর্কে মার্ক্সের শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন লেনিন এবং সেই শিক্ষাকে রাশিয়ার বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সফল করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে।

প্যারি কমিউনের এই শিক্ষাকে বেমালুম চেপে গিয়ে সংশোধনবাদী তত্ত্ববিদ কাউৎস্কি জার্মান শ্রমিকশ্রেণীকে উপদেশ দিলেন বিপ্লবের পথ, গৃহযুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করতে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের স্লোগান পরিত্যাগ করতে। কাউৎস্কির সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে লেলিন লিখলেন তাঁর অমর গ্রন্থ 'প্রলেতারীয় বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউৎস্কি'। স্তালিনের মৃত্যুর পর যখন সংশোধনবাদ নয়া আধুনিক সংশোধনবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করল তখন ক্রুশ্চভপন্থীদের কণ্ঠে কাউৎস্কির কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হল। বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস না করে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার খোয়াবই আধুনিক সংশোধনবাদীরা দেখছে। ভারতেও এদের অনুচরেরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাইন বোর্ড টাঙিয়ে জাতীয় গণতন্ত্রের তত্ত্ব প্রচার করে পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে ক্ষমতা করায়ত্ত করার কথা প্রচার করছে। এরা এতই নির্লজ্জভাবে অধঃপতিত হয়েছে যে, ভারতের ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া কংগ্রেস সম্পর্কে জনমনে মোহ সৃষ্টি করার জন্যে এরা তথাকথিত 'প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মোর্চা' গঠন করছে। বাংলাদেশেও এদের সমগোত্রীয়রা অ-ধনবাদী পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের তত্ত্ব হাজির করে বর্তমান বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়ার মূল আধার ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে আঁতাত করে এক তথাকথিত 'ঐক্যজোট' গঠন করেছে। এখন প্রশ্ন হল, পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় একটার পর একটা চিলির মতো ঘটনা ঘটবার পরেও এবং বিশেষ করে ভারতের কেরলে ও পশ্চিমবঙ্গে মার্ক্সবাদের নামাবলি গায়ে দেওয়া পার্টিগুলো দ্বারা গঠিত সাধের সরকারগুলোর হাল ও তার পরবর্তীকালে নিজেদের কর্মীদের দুরবস্থার পরেও কি রংবেরঙের বামপন্থী দলগুলো আর একটা নির্বাচনের জন্য পাঁয়তারা করবেন, না প্রকৃত মার্ক্সবাদী পথে এগোবার প্রস্তুতি নেবেন? এই প্রশ্নের সার্থক ও সঠিক নিরসনের ওপরই নির্ভর করছে আগামী দিনের বিপ্লবের সাফল্য ও ব্যর্থতা।

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামের সম্পর্ক

মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের একটা অন্যতম প্রধান সমালোচনার বিষয় হল-সমাজতন্ত্র 'প্রলেতারীয় সমাজব্যবস্থা' হওয়া সত্ত্বেও যেমন শিল্পোন্নত ধনবাদী রাষ্ট্রে প্রলেতারীয়েতরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব দেশে প্রলেতারীয় সমাজব্যবস্থা তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। সুতরাং মার্ক্সবাদী দর্শন সঠিক সমাজবিজ্ঞান হতে পারে না। মার্ক্স ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে লিখেছেন, 'কমিউনিস্টরা প্রধানত জার্মানির দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। কারণ এই দেশটি বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রাক্কালে সমুপস্থিত। এই বিপ্লব সাধিত হবে ইউরোপীয় সভ্যতার সবচাইতে অগ্রগামী অবস্থায়। সতের শতকের ইংল্যান্ডের, আঠার শতকের ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় আরো অগ্রসর শ্রমিকশ্রেণী এই দেশে আছে এবং জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লব হবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পূর্বাবস্থা।'

এর অর্থ বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু জার্মানিতে সরে গিয়েছে। যেহেতু বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র জার্মানি, তাই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছে জার্মানিতে আর জার্মানির মার্ক্স এঙ্গেলস্ এর আবিষ্কারক। কিন্তু তৎকালে জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃত্ব (কাউৎসিক, বার্নেস্টাইন প্রভৃতি) বিপ্লবের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সংশোধনবাদীতে পরিণত হওয়ায় জার্মানির বিপ্লবী অবস্থাকে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষে বিপ্লবের জন্য কাজে লাগানো সম্ভব হয় নি।

বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্র অতঃপর জার্মানি থেকে রাশিয়ায় সরে যায়। ১৯০২ সালে লেনিন তাঁর 'কি করতে হবে?' গ্রন্থে লিখলেন, 'ইতিহাস আমাদের ওপর একটা আশু কর্তব্য চাপিয়ে দিয়েছে, যে কোনো দেশের শ্রমিকশ্রেণীর আশু কর্তব্যের চাইতে আমাদের এই কাজ সবচাইতে বেশি বিপ্লবী। এই কর্তব্য সমাধান কেবলমাত্র ইউরোপের নয়, উপরন্তু এশিয়াটিক প্রতিক্রিয়ার সবচাইতে শক্তিশালী স্তম্ভের বিনাশ সাধনে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী শ্রেণীর অগ্রবাহিনীতে পরিণত করবে।' এর অর্থ বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু রাশিয়াতে সরে এসেছে। কেননা, সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বগুলো এই দেশেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। বিপ্লবের ঝটিকাকেন্দ্রবিন্দু আবার সরে এসেছে। এবার আর ঝটিকাকেন্দ্র ইউরোপ নয়–এবার ঝটিকা কেন্দ্র সম্প্রসারিত এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায়। মার্ক্সের যুগ থেকে লেনিনের যুগ যেমনি পৃথক ছিল তেমনি লেনিনের যুগ থেকে এ যুগও পৃথক। লেনিন তত্ত্বে ও প্রয়োগে সাম্রাজ্যবাদী যুগে মার্ক্সবাদকে বিকশিত করেছেন। আজকের যুগ হল নয়া উপনিবেশবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ। এ যুগে মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদ তত্ত্বে ও প্রয়োগে কি হবে তা দেখিয়েছেন মাও সে তুং। লেনিন শিল্পোন্নত দেশের

www.nagorikpathagar.org

শহরভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ পথনির্দেশ আবিষ্কার করেছিলেন, আর মাও সে তুং আবিষ্কার করেছেন শিল্পে অনুন্নত গ্রামভিত্তিক জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাধারণ পথনির্দেশ।

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বর্তমান বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বগুলো কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এইসব অঞ্চলের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন আমাদের যুগের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এই তিন মহাদেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন সমসাময়িক বিশ্বের শ্রমিক বিপ্লবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই তিন মহাদেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের সঠিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে না পারলে বিপ্লবী আন্দোলনে ব্যর্থতা অনিবার্য। স্তালিনের মতে, জাতীয় সমস্যা মূলত শ্রেণী সমস্যা। প্রত্যেক জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে মূলত তিনটি প্রধান সমস্যা দেখা দেয় : (ক) জাতি সমস্যা (খ) শ্রেণী সমস্যা এবং (গ) রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের সমস্যা। সাম্রাজ্যবাদ যেসব দেশে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ চালায় অথবা উপনিবেশ স্থাপন করে সেসব দেশে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম প্রাধান্য অর্জন করে। কৃষকরা জাতির মূল অংশ হওয়ার ফলে কৃষকসমাজকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সামিল করতে না পারলে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম সফল হতে পারে না। কৃষক সমাজকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সামিল করানোর জন্যে মুক্তি আন্দোলনে অবশ্যই সামন্তবাদবিরোধী কর্মসূচি থাকতে হবে। কিন্তু এই সামন্তবাদ-বিরোধী সংগ্রামের বর্শাফলক নিক্ষিপ্ত হবে সুনির্দিষ্টভাবে জাতীয় স্বার্থবিরোধী সামন্ত ভূস্বামীদের বিরুদ্ধেই। অপরদিকে দেশপ্রেমিক সমস্ত ভূস্বামীরা এই বিশেষ সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় বিপ্লবের মিত্র হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ যখন পরোক্ষভাবে দেশীয় প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শোষণ চালায় তখন জাতীয় সংগ্রামের তুলনায় শ্রেণীসংগ্রামই প্রাধান্য অর্জন করে। এমনি অবস্থাতে সামন্তবাদের মধ্যে দেশপ্রেমিক ও দেশদ্রোহী বিচারের প্রশ্ন ওঠে না। সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণ করতে না পারলে জাতীয় সংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রামের সম্পর্ক নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেই শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকাতে জনগণের অগ্রসেনার ভূমিকা পালন করেছে ও সমগ্র জাতি ও জনতার নেতৃত্বের আসনে পরিবৃত হয়েছে। চীনে জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে ১৯৩৭ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় প্রতিরোধ সংগ্রাম পার্টিকে চীনা জাতির আস্থা ও নেতৃত্ব অর্জনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে ভিয়েতনাম ১৯৩৯ সালে জাপানের বিরুদ্ধে ও ১৯৪৫ সালে ফরাসি উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের মাধ্যমে ভিয়েতনাম ওয়ার্কারস পার্টি সমগ্র ভিয়েতনামি জাতির মুক্তিসংগ্রামে অগ্রসেনার স্থান দখল করেছে। এমনিভাবে এ সকল দেশে কৃষকের

www.nagorikpathagar.org

সামন্তবাদবিরোধী অভ্যুত্থানকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অভ্যুত্থানে পরিণত করা হয়েছে। এসব দেশে শ্রেণীসংগ্রাম দেশপ্রেমিক যুদ্ধের রূপ নিয়েছে এবং জাতীয় মুক্তি অর্জনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃত্বে এসব দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথও উন্মুক্ত হয়েছে। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে জনযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে এসব পার্টিগুলো জাতীয় পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছে এবং সমগ্র জাতির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে। হো চি মিন তাঁর 'The path which led me to Leninism' প্রবন্ধে স্বীকার করেছেন, 'At first patriotism not yet communism led me to have confidence in Lenin, in the Third International, step by step,along the struggle by studying Marxism-Leninism parallel with participation in practical activities I gradually came upon the fact that only socialism and communism can liberate the oppressed nations and the working people throughout the world from slavery.'

একথা এখন স্পষ্ট যে জাতীয় সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামের সঠিক নিরূপণ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের একটি মৌলিক প্রশ্ন। ভারত ও চীনে একই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও চীন বিপ্লবে সফলতা অর্জনের পঁচিশ বছর পরেও ভারত উপমহাদেশ তথা আমাদের বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবে সফলতা অর্জনের তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এর অন্যতম একটি প্রধান কারণ হল জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে শ্রেণীসংগ্রামের সঠিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে না পারা। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির গোড়াপত্তনের যুগে এম এন রায়ের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ১৭ই অক্টোবর তারিখে তাসখন্দে এম এন রায়সহ সাতজনকে নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের 'কমিশন অন দি ন্যাশনাল অ্যাণ্ড কলোনিয়েল কোশ্চেনে' রিপোর্ট দিতে গিয়ে রায় মত প্রকাশ করেছিলেন, 'The popular masses of India are not fired with a national spirit. They are exclussively interested in problems of an economic and social nature. The elements exist in India for creating a powerful Communist party. But as far as the broad popular masses are concerned the revolutionary movement has nothing in common with the national liberation movement.' (The Theory of the 'Progressive National Bourgeoisie' —by Alec Gordon, Journal of the Contemporary Asia, Nov. 1973).

www.nagorikpathagar.org

এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, রায়ের এই মতবাদ ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনীতিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিল। যে রায় ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই দেখতে পান নি তাঁদের মতো তত্ত্ববিদদের নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এহেন দুর্গতি না হয়ে আর গত্যন্তর আছে কি?

ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির যথার্থ উদ্যোগ ও নেতৃত্ব না থাকায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হাতে চলে যাওয়ার ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ব্রিটিশ-ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব তার যথার্থ ভূমিকা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ায় আজো ভারত উপমহাদেশের তিনটি দেশেই জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হতে পারে নি— সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা। পাকিস্তানোত্তরকালে এদেশের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের সমস্যার প্রকৃতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে না পারায় জাতীয় সমস্যাকে উঠতি বুর্জোয়াশ্রেণী উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রভাবে প্রভাবিত করে এবং পূর্ববাংলার ক্ষেত্রে এই নেতৃত্ব যায় আওয়ামী লীগের হাতে। আজকের যুগে যেহেতু কোনো বুর্জোয়া পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় সমস্যার সঠিক সমাধান হয় না তার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই আজকের বাংলাদেশেও জাতীয় সমস্যার সমাধান হয় নি এবং বৈদেশিক দাসত্বের বন্ধন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরো তীব্র হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে মুক্তি আন্দোলনে এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম সংশোধনবাদীরা জাতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে তাদের কিছু করণীয় নেই বলে উগ্রজাতীয়তাবাদী অন্ধ সমর্থন দিয়ে গেলেন এবং বাঙালি বুর্জোয়াদের লেজুড় হিসেবে কাজ করলেন। অপরদিকে বিপ্লবীরাও জাতীয় সমস্যার প্রশ্নে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারলেন না, শ্রেণীসংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রামের সঠিক সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারলেন না—যার ফলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বাঙালি জাতির জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে নিজস্ব শ্রেণীগত দুর্বলতার ফলে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের নিকট বিসর্জন দিলেন। তাই জাতীয় সমস্যাকে উপলব্ধি করতে না পারার ব্যর্থতার খেসারত এদেশের প্রগতিশীলদের আরো অনেক দিতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র

শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলনের বিপ্লবের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের প্রশ্নটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিসমূহকে বারবার বিভ্রান্ত করেছে। বিপ্লবীতত্ত্ব ছাড়া বিপ্লবী পার্টি হয় না। কিন্তু বিপ্লবীতত্ত্ব কোথা থেকে আসে? মাও সে তুং চীন-বিপ্লবের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন–চীন বিপ্লবের বাস্তব অনুশীলনে তারা মার্ক্সবাদ লেলিনবাদ প্রয়োগ করেছেন। বাস্তব অবস্থার নিরিখেই

www.nagorikpathagar.org

তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে হয়। পায়ের মাপ অনুসারে যেমনি জুতো পরতে হয়, জুতোর সঙ্গে পা-কে মেলানোর জন্যে যেমনি পা কেটে জুতোর উপযোগী করা সম্ভব নয়; বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তত্ত্বকে অবশ্যই বাস্তবানুগ হতে হবে। জনগণের মধ্যে অনুসন্ধান কার্য চালিয়েই সঠিক বিপ্লবীতত্ত্ব অর্জন করা সম্ভব। জনগণের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-চেতনাকে কেন্দ্র করেই বিপ্লবী-তত্ত্ব গড়ে উঠবে। বাইরে থেকে তত্ত্ব জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বিপ্লব আমদানি বা রপ্তানি-যোগ্য পণ্যও নয়। সোভিয়েত রাশিয়াতে দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম শ্রমিক-বিপ্লব সফল হওয়ায় স্বাভাবিক কারণে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতার আসনে পরিবৃত হয়। এর ফলে পৃথিবীর বহু কমিউনিস্ট পার্টি অন্ধ অনুকরণ করতে থাকে এবং সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলে। সর্বহারার আন্তর্জাতিকবাদের নামে বিভিন্ন দেশে অন্ধ অনুকরণবাদ দেখা যায়। এর ফলে এইসব দেশের পার্টিগুলো দেশের বাস্তব অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী বিপ্লবী লাইন নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হল। বিশেষ করে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বে পরিচালিত হত। আন্তর্জাতিকের অনেক নির্দেশ সঠিক মনে না হলেও দেশের ভিতরে যারা আন্দোলন পরিচালনা করতেন তাঁরা তা অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। তা ছাড়া এই আন্তর্জাতিকে ভারতীয় পার্টির তরফ থেকে যিনি থাকতেন তিনি অধিকাংশ সময় বাইরে কাটাতেন এবং দেশের মাটির সঙ্গে তাঁর আদৌ কোনো সংস্পর্শ থাকত না। এ প্রসঙ্গে মুজাফ্ফর আহমদ তাঁর 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থে বলেছেন—'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালকে কেন্দ্র করে আমরা ভারতে কাজ আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু তার গোড়াতে গলদ থেকে গিয়েছিল। আগেই আমি বলেছি যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তরফ হতে ভারতের চার্জে ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তিনি থাকলেন কয়েক হাজার মাইল দূরে জার্মানিতে আর আমরা থাকলাম উপমহাদেশের নানা স্থানে। না আছে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে, না আছে আমাদের দেশের ভিতরও একের অন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়'। এতদ্ব্যতীত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি ও সংগঠনে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিরও বিরাট প্রভাব ছিল। এবং তাও এই তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কল্যাণে। ভারতের পার্টির ওপর ব্রিটিশ পার্টির এই প্রভাবও ভারতীয় কমিউনিস্টদের তত্ত্বকে ভারতের বাস্তব থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদবিরোধী ফ্রন্টে সোভিয়েত রাশিয়া ও ব্রিটেন থাকায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম পরিত্যাগ করে গান্ধীর নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করল। আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে এটা হল অন্ধ আন্তর্জাতিক দাসত্ব। যে দেশের বিপ্লবী পার্টি এই তাত্ত্বিক দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারে না, তার পক্ষে বিপ্লব করা সম্ভব নয়। কাজেই বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে আজ আর কোনো পিতৃ পার্টি কিংবা পরিচালক রাষ্ট্র

www.nagorikpathagar.org

নেই। বিশ্বপরিসরে শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে একটা সমস্যাগত ঐক্য রয়েছে, ঐক্য রয়েছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে। ১৯৭১ এর নভেম্বরে পারেত্রো ন্যান্নির চীন সফর উপলক্ষে চৌ এন লাই-এর বক্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। '৭১-এর ২০শে নভেম্বরে 'আভান্টি' (Avanti) পত্রিকায় চৌ এন লাই-এর বক্তব্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে, 'Chou En Lai cited certain past experiences to support the thesis that as soon as international movements and organisations come into existence, national revolutions break-down. This occurred a century ago with the Paris Commune, an attempt which coincided with the disintegration of the First International. In 1917 the October Revolution took place after the falilure of the Second International and the Chinese revolution occurred after the break up of the third. This is the reason why the Chinese leadership feels that worker movements must rely on their own resources and that bilateral contacts between worker movements are preferable to a single international organisation. In other words, Marxist truths must be integrated with the practical experience applicable to each country. It is for this reason, as we all know that, the Chinese reject the idea of a world communist centre'. 'We cannot support' said chou En Lai, "the theory that Moscow is the centre any more than we want others to regard us as the centre. We hope and believe that the various revolutionary movements will rely on their own resources. There is no single revolutionary movement which can create the revoutionray line."

সমসাময়িককালে মস্কোর অনুসারী কমিউনিস্ট পার্টিগুলো রুশ পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। তাদের নিজস্ব স্বকীয়তা বলতে কিছুই নেই। বাংলাদেশে রুশপন্থীরা রুশ পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে শাসকশ্রেণীর অঙ্গদলে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে গণচীনের অন্ধ ভক্ত সাজতে গিয়ে কোনো কোনো বিপ্লবী বামপন্থীরা বাংলাদেশের বাস্তবতা মানছেন না এবং এখনো নিজেদের পূর্ব পাকিস্তানের পার্টি বলে দাবি করেন। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে, এ প্রসঙ্গে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চি পেঙ ফি-র মন্তব্য হল 'এটি একটি উত্তম আজ'। কিছুদিনের মধ্যে চীন যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তা হলে এরা কী বলবেন? বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ ধরনের বিবেকবুদ্ধি বিবর্জিত অন্ধ চিন্তাধারা খুবই মারাত্মক। চীন বিপ্লবের ক্ষেত্রে স্টালিনের কোনো কোনো পরামর্শকে মা সে তুং

www.nagorikpathagar.org

সঠিক মনে করেন নি এবং অন্ধভাবে মেনে নেন নি কিন্তু তাই বলে মাও স্টালিনের নিন্দাও করেন নি। এভাবেই বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে মাও-এর একটা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়েছিল। আন্তর্জাতিকতাবাদকে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে না পারলে গোলযোগ বাধে এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে বিভ্রান্তি আসে।

কখনো কখনো কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে সাময়িক সমঝোতা ও আপস হতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার জনগণ সেই সাময়িক সমঝোতায় বিভ্রান্ত হয়ে তাদের সংগ্রাম স্থগিত রাখবে। বরং বিভিন্ন বাস্তব অবস্থার নিরিখে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তারা তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। এই প্রসঙ্গে মাও সে তুং বলেন,

"Such compromise between the United States, Britain and Frace and the Sovet Union can be the outcome only of resolute effective struggle by all the democratic forces of the world against the reactionary forces of the United States, Britain and France. Such compromise does not require the people in the countries of the capitalist world, to follow suit and make compromises at home. The people in those countries will continue to wage different struggles in accordance with their different conditions." (Some points in apprisal of the present internarional situation, April 1946)"

সুতরা সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা চীনের সঙ্গে এ দেশের সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে এ দেশীয় কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা আন্তর্জাতিকতার দোহাই তুলে কিংবা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াকে প্রতিহত করার নামে যদি 'গণঐক্য জোট' করেন তা হলেই তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। এই ধরনের বিচ্যুতি এ দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বহু ক্ষতি সাধন করেছে ও করছে।

প্রতিভাবান নেতৃত্বের সংকট

প্রত্যেক বিপ্লবই তার নিজস্ব নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। রুশবিপ্লব সৃষ্টি করেছিল লেনিন ও স্টালিনকে, চীন বিপ্লবের সৃষ্টি মাও এবং ভিয়েতনামের বিপ্লব জন্ম দিল হো চি মিনকে। কিন্তু ভারত উপমহাদেশে একজন মাও কিংবা হো-র জন্ম হল না কেন? গোটা ভারত উপমহাদেশে আজ পর্যন্ত এমন কোনো বিপ্লবী তাত্ত্বিক জন্ম নিলেন না যার স্বকীয়তা ও সৃজনশীলতা কোনো অংশে মাও কিংবা লেনিনের সঙ্গে তুলনীয়? এ ধরনের সৃজনশীল ও যোগ্য প্রতিভাবান নেতৃত্বের শূন্যতা আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। যোগ্য নেতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে লেনিন বলেন, "Not a single class in history has

www.nagorikpathagar.org

achieved power without producing its political leaders, its prominent representatives able to organize a movement and lead it." (The urgent tasks of our movement. Nov. 1900).

ভারত উপমহাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যাঁরা এতকাল নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তাঁরা ইতিহাসের নবীনতম শ্রেণী তথা সর্বহারা শ্রেণীকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানে লেনিনের এই মত পূরণে সক্ষম কি না যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তা হলে কি সত্যি এদেশে তেমন কোনো প্রতিভার জন্ম হয় নি। হয়তো হয়েছে, আমরা তার সাক্ষাৎ আজো পাই নি। বাংলাদেশে আজ তেমন কোনো প্রতিভা দেখতে পাচ্ছি না কিংবা তেমন প্রতিভার জন্ম দিতে পারে এমন কোনো জনগণও আমরা দেখছি না। এদেশের জনগণ বড়জোর মাঝারি গোছের নেতৃত্বের সমজদারী করতে পারে। এই প্রসঙ্গে চীনা লেখক লু শুন বলেন, "Genius is not some freak of nature which grows itself in deep forests of wilderness, but something broughtforth and nurtured by a certain type of public. Without such a public, there will be no genius. When crossing the Alps, Napoleon, once declared I am higher than the Alps! What a heroic statement! But we must not forget how many troops he had at his back. Without these troops he would simply have been captured or driven back by the enemy on the other side, and then, far from seeming heroic behaviour would have appeared that of a mad man. To my mind before we expect a genius to appear we should first call for a public capable of producing genius".

প্রতিভা জন্ম নেয়, জোর করে প্রতিভা সৃষ্টি করা যায় না। সমাজে শত শত প্রতিভার জন্ম হলেও তার বিকশিত হবার ভিত্তি না থাকলে তার অপমৃত্যু ঘটবে। যে ধরনের জনতা প্রতিভাবান নেতৃত্বের বিকাশে সহায়ক তেমনি ধরনের জনগণ সৃষ্টির জন্য আজ সর্বাধিকভাবে জনগণের মধ্যে কাজ করতে হবে।

ধর্ম ও সমাজতন্ত্র

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ক রয়েছে। আমরা জানি যুগ যুগ ধরে শোষকশ্রেণী ধর্মকে মেহনতি মানুষের শোষণ মুক্তির সংগ্রামকে ধ্বংস করার একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। এতৎসত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে ধর্মই প্রধান অন্তরায় নয়। ধর্ম হল সমাজের উপরাবয়ব, অর্থনীতি হল তার মূল ভিত্তি। এক কথায় ধর্ম সমাজের superstructure-এর একটি অংশ মাত্র। অপরদিকে উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সমাজের

www.nagorikpathagar.org

infrastructure। সমাজ-কাঠামোর মূলভিত্তিকে আঘাত হানতে পারলে উপারাবয়ব ধ্বসে পড়বেই। একে জবরদস্তি করে ধ্বংস করার প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে এবং মেহনতি মানুষের মুক্তি আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করেছে। ব্যাপক জনতার মধ্যে শ্রেণী সংগ্রামের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দিতে না পারায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা ও উগ্র জাতীয়তাবাদ জনতার মুক্তি আন্দোলনকে বারবার বিভ্রান্ত করেছে।

অনেক সময় ধর্মেরও সংগ্রামী ভূমিকা থাকে। বাংলাদেশের কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহে ধর্ম সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল; যেমন গারো বিদ্রোহ, ওহাবী বিদ্রোহ এবং ফারাজী বিদ্রোহ। সামন্ত প্রথামূলক সমাজে শোষকগোষ্ঠীর প্রচলিত ধর্ম যখন জনসাধারণকে শোষণ ও পীড়নের হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখনই যে-কোনো সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলন শোষকশ্রেণীবিরোধী গণসংগ্রামের হাতিয়ারে পরিণত হতে বাধ্য। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগে ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন কৃষক বিদ্রোহের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। জার্মানির কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বলেন, "সমগ্র মধ্যযুগব্যাপী সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। সে যুগের অবস্থা অনুযায়ী এই সংগ্রাম প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী অতীন্দ্রিয়তাবাদের আকারে অথবা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আকারে দেখা দিয়েছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে ষোড়শ শতাব্দীর সমাজ সংস্কারবাদের পক্ষে এই অতীন্দ্রিয়তাবাদ ছিল অপরিহার্য। মুয়েঞ্জার (জার্মানির ষোড়শ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের নায়ক) স্বয়ং এই অতীন্দ্রিয়তাবাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। এই বিরুদ্ধ ধর্মমত দেখা দিয়েছিল অংশত আলপাইন গোষ্ঠীবদ্ধ পশুপালকদের জীবনের ওপর সামন্তপ্রথার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ঐ পশুপালকদের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ রূপে, অংশত শহরাঞ্চলের ঘুণে ধরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের প্রকাশ রূপে এবং অংশত কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রকাশ রূপে।" (এঙ্গেলস, The Peasant War in Germany).

অবস্থা বিশেষে ধর্মের এই সংগ্রামী ভূমিকাকে স্মরণ রেখেই আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দেলনকে এগিয়ে নিতে হবে। আমাদের দেশের জনগণ ধর্মভীরু। জনগণের এই ধর্মপরায়ণতাকে এ-দেশের বাস্তব অবস্থার একটি উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় প্রতিক্রীয়াশীল গোষ্ঠীর অপপ্রচার মূল সংগ্রামকে ব্যাহত করবে।

জনগণের আঞ্চলিক সংস্কার আচার-আচরণ ও ধর্মীয় বিশ্বাসে যেন আঘাত না লাগে সে জন্য হো চিন মিন ও ভিয়েতনামের কমিউনিস্টরা কঠোর সংযম মেনে চলতেন। একবার হো-র এক সহকর্মী তাঁদের জন্য গো-মাংস কিনে এনেছিলেন। হো-র সন্দেহ ছিল যে পরিবারে তাঁরা থাকেন তারা গো-মাংস খান না। খোঁজ করে জানা

www.nagorikpathagar.org

গেল হো-র অনুমান সঠিক। তিনি তখন দূরে গিয়ে মাংস রান্না করার নির্দেশ দিলেন। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে হলে সমাজতন্ত্রী কর্মীদের এই ধরনের কঠোর সংযমের অনুশীলন করতে হবে ও এর অর্থ এই নয় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশয় দেওয়া কিংবা ধর্মীয়বোধকে সুড়সুড়ি দেওয়া। এটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আমরা যখন বাংলাদেশে বসে বিতর্কে লিপ্ত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে 'ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের' যোগ দেওয়া কতটুকু সঠিক তখন আমরা দেখছি ভিয়েতনাম ওয়ার্কারস পার্টির মুখপত্র 'নান দান' এই সম্মেলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকবে কামনা করে এই সম্মেলনকে অভিনন্দিত করেছে। এ ধরনের রাজনৈতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে এর মূল রাজনৈতিক উপাদান কী। ইসলামি কথাটা এর সঙ্গে জড়ানো রয়েছে বলেই সর্বতোভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হবে তা ভাবা মোটেই সমীচীন নয়। কম্বোডিয়ার জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের একটি কর্মসূচি হল বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা প্রদানকরা। তা হলে কী আমাদের ধরে নিতে হবে কম্বোডিয়ার 'জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট' একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা? আসলে সংগ্রামের গতি কোন দিকে সেটাই মূল বিচার্য বিষয়। আজকের যুগে যে-কোনো আন্দোলন যার রুশ ও মার্কিন এই দুই মহাশক্তিবিরোধী ভূমিকা রয়েছে তাই কমবেশি প্রগতিশীল। আমাদের দেশে ধর্মের সাথে অনেক অধর্ম ও অনর্থ ঘটেছে। সুতরাং এদেশে জাতীয় মুক্তি ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্ম কতখানি অন্তরায় ও কতখানি সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে তার একটা সুস্পষ্ট মূল্যায়ন না থাকলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাহত হতে বাধ্য।

বুর্জোয়াদের সমাজতান্ত্রিক স্লোগান

দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহ বিশেষ করে ভারত, শ্রীলঙ্কা বার্মা ও বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রী সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঘোষিত লক্ষ্য। আবার এ সব দেশে সমাজতন্ত্রের নামে এক ধরনের রাজনৈতিক আদর্শের জগাখিচুড়ি হাজির করা হচ্ছে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এর রূপ হল 'ইসলামী সমাজতন্ত্র', ইন্দোনেশিয়ায় 'ইন্দোনেশীয় সমাজতন্ত্র', বার্মায় 'বৌদ্ধ সমাজতন্ত্র', ভারতে গান্ধীবাদের 'সর্বোদয় সমাজতন্ত্র'। আজকের বিশ্বে মূল প্রবণতা হল সমাজতন্ত্র। ঔপনিবেশিক ও নয়া ঔপনিবেশিক দেশে রাজনৈতিক দলগুলো জনপ্রিয়তা বজায় রাখার জন্যই সমাজতন্ত্রের স্লোগান তোলে অথচ সমাজতন্ত্র তাদের আন্তরিক বিশ্বাসের ব্যাপার নয়। ভারতের কংগ্রেস ৫২ সাল থেকেই সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। এতৎসত্ত্বেও সমাজতন্ত্রের ঘোর শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারতের শাসকদের কোটি কোটি ডলার সাহায্য ও ঋণদান অব্যাহত রেখেছে। আজ পর্যন্ত ভারতে সমাজতন্ত্রের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অপরদিকে ভিয়েতনাম শুধুমাত্র জাতীয় মুক্তি ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সংগ্রামে লিপ্ত হতে গিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের

www.nagorikpathagar.org

আগ্রাসী হামলার সম্মুখীন হয়েছে। কারণ, ভিয়েতনামের পথই সঠিক পথ এবং তা পুঁজিবাদী বিশ্বের শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থকে সত্যিকার অর্থে ক্ষুণ্ন করবে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে জাতীয় মুক্তি ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অর্জনের সংগ্রামই সমাজতন্ত্রের পথে একমাত্র সঠিক পদক্ষেপ। এসব দেশে সমাজতন্ত্র যেসব রাজনৈতিক দলের সাধারণ দাবি তাদেরকে অবশ্য সন্দেহের চোখে দেখতে হবে। বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র করতে গিয়ে জাতীয়করণের নামে লুণ্ঠন ও তস্করবৃত্তির পথে এক শ্রেণীর লুটেরা পুঁজিপতির জন্ম হয়েছে। এরা এদের পুঁজি দেশের শিল্প বিকাশের স্বার্থে বিনিয়োগ না করে বিদেশের ব্যাঙ্কে জমা করছে। এ ধরনের সমাজতন্ত্রের চাইতে পুঁজিবাদ অনেক শ্রেয়। কারণ, পুঁজিবাদের ও একটা গঠনমূলক ভূমিকা থাকে। আর বাংলাদেশের এই লুটেরা শ্রেণী, যে হংসী সোনার ডিম দেয়, তাকেই হত্যা করে। এমন প্রশ্ন উঠতে পারে আওয়ামী লীগের মতো একটা বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল যারা স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিমালিকানায় বিশ্বাসী হওয়াই সঙ্গত তার জাতীয়করণের পথ গ্রহণ করল কেন? এর একটি মাত্র সম্ভাব্য জবাব রয়েছে। বাংলাদেশ ধরনের জাতীয়করণে রাতারাতি লুটেরা পুঁজির জন্ম দেওয়া যত সহজে সম্ভব অন্য কোনো পথেই তা সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের এই জাতীয়করণের অভিজ্ঞতা থেকে যাঁরা সত্যিকার অর্থে সমাজতন্ত্র আনতে চান তাঁদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে।

অনেকে যাঁরা আন্তরিকভাবে সমাজতন্ত্র কামনা করেন তাঁরা সকলেই একথা স্বীকার করবেন যে, একটি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্ব ব্যতিরেকে কোনো দেশেই সমাজতন্ত্র আসতে পারে না। আমাদের দেশে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীদের অনৈক্য এ দেশের সত্যিকার মুক্তি অর্জনের পক্ষে বিরাট অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। বামপন্থী রাজনীতিতে বর্তমানে বিরাজমান নৈরাজ্য, বিভ্রান্তি মূলত ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের গোড়ার গলদ থেকেই উদ্ভূত। প্রথমত প্রবাসে ভারতের কমিউনিষ্ট পাটির যে গোড়াপত্তন হয়েছিল তার সঙ্গে দেশের যোগসূত্র কমই ছিল। একটি কমিউনিস্ট পার্টি দেশের বাস্তব সংগ্রামের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠে ও বিকশিত হয়। ভারতে সেই পথ অনুসৃত হয় নি। ১৯৩৩ সালে মীরাট জেলে বসে পার্টিকে যখন দ্বিতীয় বারের জন্য পুনর্গঠিত করা হয় সে সময় যাঁদেরকে নিয়ে পার্টিকে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল তাঁরা ছিলেন জেলের ভিতর, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। অপরদিকে যেসব অভিজাত সম্প্রদায়ের ছেলেরা বিলেতে গিয়ে ব্রিটিশ পার্টির সংস্পর্শে এসে কমিউনিস্ট হতেন দেশে ফিরে এসে তাঁরাই উচ্চশিক্ষার বদৌলতে পাটির নেতৃত্বের আসনে বসতেন। এর ফলে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সুষ্ঠু ও সঠিক নেতৃত্ব বিকাশের বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি হয়। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম পার্টিকে দীর্ঘদিনের জড়তা ও স্থবিরতা থেকে মুক্ত করতে যাচ্ছিল। কারণ

www.nagorikpathagar.org

তেলেঙ্গানার পথে ছিল ভারতীয় বিপ্লবের সঠিক পথ। একদিকে জোশির সংশোধন–বাদী নেতৃত্ব অন্যদিকে রনদীভের ট্রটস্কীবাদী বিচ্যুতি তেলেঙ্গানার সংগ্রামকে ডান ও বাম থেকে ছুরিকাঘাত করে। এমনিভাবে উপমহাদেশের বিপ্লবী সম্ভাবনা দারুণভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তেলেঙ্গানার মতো আরেকটি সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল ১৯৬৭ সালে 'নকশাল বাড়ী' আন্দোলনে। নকশাল বাড়ির ঘটনা এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করল সত্য কিন্তু বামবিচ্যুতি এই আন্দোলনকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক রাজনীতিহীন সন্ত্রাসবাদী হত্যাকাণ্ডের পথে নিয়ে গেল। যার মূল প্রতিবেদন হয়ে দাঁড়াল মুষ্টিমেয় বীরেরা ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে, ব্যাপক জনগণ নয়। 'জনগণই ইতিহাসের নির্মাতা'–মাও সে তুঙ-এর এই বক্তব্য বিস্মৃত হল। এরই ফলশ্রুতিতে আসল গণসংগঠন ও জনগণের আর্থিক সমস্যা নিয়ে আদৌ আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তার অস্বীকৃতি। জনগণ ও কমিউনিস্টদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লেনিন বলেন, 'A vanguard performs his task as vanguard only when it is able to avoid becoming divorced from the masses it leads and is able really to lead the whole mass for war,' (On the Significance of Militant Materialism) তাই আমাদের দেশের বামপন্থী আন্দোলনে যে নৈরাজ্য ও বিভক্তি বিরাজমান তার মূলে রয়েছে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা। জনগণ থেকে শিক্ষা অর্জন করতে না পারলে ও জনগণের সঙ্গে সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে এই নৈরাজ্য ও বিভক্তি সহজে কাটবে না। তাই সকল বামপন্থীর কর্তব্য হল জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রচনা করার মাধ্যমে সঠিক রাজনীতি নির্ধারণ করা ও সেই সঠিক রাজনীতির ভিত্তিতে বামপন্থী ঐক্য গড়ে তোলা। অন্যথায় এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন একটি সুদূর পরাহত স্বপ্নই থেকে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

পুরোগামী জননেতা

লোকান্তরিত মওলানা ভাসানী শাশ্বত ভবিতব্যের জন্য লোক-অন্তরে ঠাঁই নিয়েছেন। মৃত্যু জীবনের পাশাপাশি এক দ্বান্দ্বিক মহাসত্য। প্রকৃতির এই অমোঘ সত্যকে অসম্ভব জয়ে পারঙ্গম মানুষ আজো নিয়ন্ত্রিত করতে পারে নি। তাই আর সব নশ্বর মানুষের মতোই মওলানা ছিলেন একজন নশ্বর মানুষ। একজন নশ্বর মানুষের তুলনায় মওলানা দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন। তাঁর আয়ুষ্কাল আরো দীর্ঘায়িত হলে আমরা হয়তো আশ্বস্ত হতাম। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে প্রকৃতির নিকট আমাদের পরাভব স্বীকার করা ভিন্ন আর কি গত্যন্তর আছে? এতৎসত্ত্বেও তাঁর মৃত্যু এক মহীয়ান মৃত্যু। মরেও তিনি আজ অমর। লোকান্তরিত হয়েও লোক-অন্তরে তাঁর আসন চিরবিদ্যমান থাকবে।

ইতিহাসে খুব কম মানুষের ভাগ্যেই এই সৌভাগ্য ঘটে থকে। এমনকি অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষও এই ভাগ্যে ভাগ্যবান হন না। সভ্যতার উষালগ্নে আদিম দাস সমাজ থেকে আজ পর্যন্ত যত মহাপুরুষ মানব সভ্যতার প্রগতির ইমারত নির্মাণে যে অকিঞ্চিৎকর অবদান রেখেছেন মওলানা তাঁদের একজন। তাই, স্পার্টাকাস, টিটান, জোসেফ মার্তি, ভলতেয়ার ও গ্যারিবল্ডির পাশাপাশি আর একটি নাম মওলানা ভাসানী।

গিনির জাতীয় নেতা সেকুতুরে তাঁর 'আফ্রিকান ইমানসিপেশন' নামক ভাষণে ১৯৫৯ সালে বলেছিলেন, "In the world to-day, there are three types of organizations and movements. There is the party that speaks of the past and lives on the basis of the past. The members of this party continuously say, "We have done such and such a thing in 1900, we have done such and such in 1910"; they are not capable of saying, "this is what we have done today, and this is what we should do tomorrow." The second category lives only in the present, and its workers are concerned exclusively with day to day problems and makes no effort to analyse these problems and carry out the changes that would resolve them in the future....Indeed, it is in so far as one is concerned with what will take place tomorrow that one can take the appropriate mesures to make the future of the country more happy and prosperous.".

www.nagorikpathagar.org

মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন নেতা, এমন একটি প্রতিষ্ঠান, এমন একটি প্রতীক, যিনি অতীতের সাফল্য কিংবা বর্তমানের বিশৃঙ্খলা নিয়ে চিন্তান্বিত ছিলেন না। একটি সুন্দর আগামী দিন সৃষ্টিই ছিল যাঁর রাজনীতি ও সকল কর্মকাণ্ডের মূল মর্মবস্তু। এ কারণেও হয়তো মওলানার অনেক উক্তি, অনেক কর্মসূচি সাধারণের চোখে বেখাপ্পা ঠেকেছে, কিংবা একপেশে দোষে দুষ্ট মনে হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তার আরাধ্য আগামী দিন যখন একটি বর্তমানে কিংবা অতীতের ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে তখনি আমরা খুঁজে পাই তাঁর অসামঞ্জস্য ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের যথার্থতা।

একজন মহাপুরুষের সঙ্গে একজন সাধারণের তফাত কোথায়? তিনিই মহাপুরুষ, তিনিই প্রতিভাধর যিনি পারেন বর্তমানের জড়তা কিংবা অতীতের অভ্যাসকে অস্বীকার করে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শেখাতে। এই ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শেখানো কোনো অপরিণামদর্শীর স্থূল হঠকারিতা নয়। কিংবা বাস্তববোধ বিবর্জিত ইউটোপিয়ার রাজ্যে বিচরণও নয়। ইতিহাসের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে আগামী দিনকে দেখতে পারার কুশলতায় মওলানা ছিলেন একজন দূরদর্শী মহানায়ক। উপমহাদেশের ইতিহাসে এমন সুদূর প্রসারী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহানায়কের আবির্ভাব হয়েছে কি না বলা শক্ত। তাই, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রতিভা বিচারের যে কষ্টি পাথর হাজির করেছিলেন, মওলানা ছিলেন তারই নিরিখে একজন মহাপুরুষ। মিল বলেছিলেন, "Genius has a tendency to break the existing customs of the society." এই প্রচলিত প্রথার প্রতি অনাস্থার নীতি মওলানা চিরকাল অনুসরণ করেছেন। এ কারণেই মওলানা ভাসানী উপমহাদেশের অন্যান্য জননেতাদের তুলনায় জনগণের অনেক কাছাকাছি, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অনেক বেশি মূর্ত প্রতীক হতে পেরেছিলেন।

মওলানার জন্ম হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে গ্রামবাংলার এক মাঝারি কৃষক পরিবারে। তাঁর দীর্ঘ সত্তর বছরের রাজনৈতিক জীবনে তাঁর এই শ্রেণীভিত্তি তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বস্তুতপক্ষে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মকাণ্ডকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে তাঁর এই অর্থনৈতিক অবস্থানকে। সেকালে তাঁর পিতার মতো বাংলার লক্ষ লক্ষ কৃষক পরিবার ছিল সামন্ত শোষণ জর্জরিত। তাই জমিদার, মহাজনদের অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রজাসাধারণের স্বার্থে আন্দোলন সংগটিত করার মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। আসামে 'লাইন-প্রথা'র বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৩৩৭-এ সন্তোষের অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগঠন, সিরাজগঞ্জে বঙ্গ-আসাম প্রজা সম্মেলন, ১৩৩৮ সালের শেষাশেষিতে রংপুরের গাইবান্ধার প্রজা সম্মেলন প্রভৃতি তাঁর আজন্ম লালিত সামন্তবাদ বিরোধী শ্রেণী ঘৃণারই

www.nagorikpathagar.org

বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু ইতিহাস চেতনায় সচেতন মওলানা অচিরেই বুঝতে পারলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র সামন্তবাদের রক্ষকই নয় বরং এর ওপর ভর করেই সাম্রাজ্যবাদ এদেশের মাটিতে টিকে আছে। সুতরাং সেই থেকে মওলানার আন্দোলনের বর্শফলক দ্বিমুখী নিক্ষিপ্ত হল। তিনি বুঝতে পারলেন বৃহত্তর কৃষক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে না পারলে কোনো আন্দোলনকেই সফল করা সম্ভব হবে না। সত্যিকার অর্থে বলতে কি এই সত্যটি ব্রিটিশ শাসিত ভারতে কোনো জাতীয় নেতার পক্ষেই সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি। এমনকি জওহরলাল নেহেরুও জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কৃষক সংগ্রামকে সম্পৃক্ত করার এক ব্যর্থ-প্রয়াস চালিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশে কৃষক সংগ্রাম সংগঠিত করতে গিয়ে তার সেই ব্যর্থতার কথা আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত মওলানার মতো আর কারোরই কৃষকদের সঙ্গে তেমন কোনো নাড়ির যোগ না থাকাই বোধ হয় এই ব্যর্থতার কারণ। এই বিচারে সমকালীন জননেতাদের তুলনায় মওলানা ভাসানী জাতীয় সংগ্রামের এই যথার্থ রূপকে অনেক সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একটি সাম্রাজ্যবাদ শাসিত দেশে কিংবা একটি আধা ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন হল মূলত কৃষক আন্দোলন, যেহেতু জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হল কৃষক সমাজ।

জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯১৯ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে মওলানা ভাসানী সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পুরোধার আসনে পরিবৃত হন। মওলানা কখন কোন সালে কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন তার সঠিক দিন কাল নিয়ে বিতর্ক আছে। তার মুসলিম লীগে যোগদানের কারণ ছিল তৎকালীন বাংলার মুসলমান কৃষক প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেসের ব্যর্থতা। কিন্তু, কোনো প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি মওলানাকে মুসলিম লীগে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ করে নি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সন্তোষের হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে আয়োজিত মওলানার এক সভার কাহিনী থেকে। এ সম্পর্কে সাহিত্যিক ইব্রাহীম খাঁ লিখেছেন, "মুহরম উপলক্ষে মওলানা সা'ব কাগমাইরে সভা করবেন ঠিক করলেন। চারিদিকে ঢোল-শোহরত দেওয়া হল। তিনি দরগার পারে বাসা করে বসলেন। প্রচার করলেন সভা উপলক্ষে যত লোক আসবে, তিনি সবাইকে বিনা পয়সায় গোশতের খিচুড়ি খাওয়াবেন। তবে লোক ইচ্ছা করলে সাথে করে চাল, মোরগ, খাসি, গরু, পাতা, তেল, ঘি আনতে পারে।"

সন্তোষের আমলারা ঘাবড়ে গেল। তাঁরা তার করে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট নুরন্নবী চৌধুরীকে এনে বলল, "দেশময় সাম্প্রদায়িক অশান্তির হাওয়া। এর মধ্যে এই সভা হলে হিন্দু মা-বোনের ইজ্জত যাবে, হিন্দুর বাড়ি লুট হবে, আর প্রজারা খাজনা বন্ধ করবে।" ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সভা বন্ধ করতে রাজি হলেন, মওলানা সাবের কথায়

www.nagorikpathagar.org

কান দিলেন না। এমন সময় আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে হাজির। শুনে বললাম, সভার ফলে হিন্দু মা-বোনের ইজ্জত যাবে এটা টাঙ্গাইলের মুসলমানদের ওপর একটা কলঙ্কের আরোপ। আমি সে তোহমত স্বীমার করে নেব না। শান্তি ভঙ্গ না হওয়ার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি; সভা বন্ধ করতে পারবেন না।"

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, কিন্তু এত লোক জড় হবে, এরা যদি আপনার কথা না মানে? বললাম, আপনার বন্দুকধারী শ'দুই পুলিশ আড়ালে থাকুক, যদি শান্তি ভঙ্গ শুরু হয় তবে তারা প্রথম গুলী করবে আমার বুকে তারপর অন্যদের বুকে।

সভার অনুমতি পাওয়া গেল। আমি সভাপতি হলাম। বললাম, 'মওলানা সাব, খাজনা বন্ধ করা, হিন্দুদের ওপর জুলুম অত্যাচারের কথা কিন্তু বলবেন না। এ সম্বন্ধে আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জবান দিয়েছি।' তিনি বললেন, 'বেশ বলব না, আপনার জবানের ইজ্জত তো রাখতেই হবে।

হাজার ত্রিশেক লোক জড় হল। তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন। আধঘণ্টা খানেক আমার অনুরোধ মেনে চললেন। হিন্দুদের মারতে বললেন না, কিন্তু জমিদারের খাজনা, মহাজনের পাওনা আর বর্গাদাতাদের শস্য দেওয়া বন্ধ করতে জোরেই বলে দিলেন।"

জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত কৃষক প্রজা-স্বার্থ সংরক্ষণই ছিল মুসলিম লীগে মওলানার প্রধান ভূমিকা। বস্তুত মুসলিম লীগের মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক ধারাটি বিদ্যমান ছিল মওলানা ছিলেন তারই প্রতীক। মুসলিম লীগের মতো একটি সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক দলে থেকেও মওলানা যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা করতেন তা' মওলানার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রাগ্রসরতারই প্রতিফলন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই মুসলিম লীগ যখন থেকে নিপীড়িত মুসলিম জনগণের স্বার্থে কাজ করতে ব্যর্থ হল উপরন্তু মেহনতি মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় শোষক শাসকের স্বার্থে কাজ করতে লাগল তখন থেকেই মওলানা মুসলিম লীগের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক চুকিয়ে দিলেন। বিশেষ করে '৪৮ সালের ২৭শে রমজান লালবাগ পুলিশ হত্যার ঘটনা এবং শাসনতন্ত্র সংক্রান্ত মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট মুসলিম লীগের স্বরূপ উপলব্ধি করতে মওলানাকে সাহায্য করেছিল। এ কারণেই তিনি পাকিস্তানে তৎকালীন প্রথম বিরোধী দলের গোড়াপত্তন করেন। এ সময়ের পর থেকে একাধিকবার তিনি শাসকগোষ্ঠীর রুদ্র রোষের শিকার হন। ক্রমান্বয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির গোড়াপত্তন মওলানার বিকাশমান প্রগতিশীল চরিত্রকেই প্রতিভাত করছিল।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়মে কোনো রাজনৈতিক শক্তি চিরকাল প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে না। প্রত্যেক রাজনৈতিক আন্দোলন তার বিকাশের যুগে প্রগতিশীল এবং তার পতন ও অবক্ষয়ের সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা রক্ষণশীল।

www.nagorikpathagar.org

এ কারণেই তিনি তাঁর জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করেছেন। এই দল বদলানোর পালা কোনো অসামঞ্জস্যতা কিংবা অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ নয়। বরঞ্চ তার প্রগতিশীলতার সুসামঞ্জস্যেরই প্রতিফলন মাত্র।

১৯৫৭ সালে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করিলাম কেন?' শিরোনামায় মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, "আজ আমি বলিতে চাই যে সত্য ও মিথ্যার লড়াই, শোষক ও শোষিতের লড়াই, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্যবাদের লড়াই, ধর্ম অধর্মের লড়াই– বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখন যেখানেই হইয়াছে তাহাতে যে সমস্ত নেতা ও কর্মী অংশগ্রহণ করিতেন তাহাদের ত্যাগ কোরবানি ও নির্যাতন ভোগের মাপকাঠিতে সেই সংগ্রাম বা লড়াই ততটা সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহার নজির বিশ্বনবী ও তাদের সাহাবাদের জীবনে ও বর্তমান নবীন চীনের মুক্তির ও উন্নতির ইতিহাস আমাদের সম্মুখে মওজুত।" এই উক্তি থেকেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি মওলানার প্রগতিবাদী চেতনা কত প্রখর। পাকিস্তানোত্তরকালে একাধিকবার বিভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই মওলানা এর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আগামী দিনের ইতিহাস কোন পথে এগোবে সেই ঠিকানা মওলানার জানা ছিল। তাই তো তিনি সেই ১৯৫৭ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি 'আচ্ছালামু আলাইকুম' জানাতে পেরেছিলেন। এখান থেকেই শুরু নবীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় যাত্রা। বাংলাদেশ যে ঐতিহাসিক সত্য হয়ে দাঁড়াবে মওলানা তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন।

এ জন্যেই আমরা তাকে দেখি স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আপসহীন, জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও সম্পদ বন্টনের দাবিতে, ভাষার অধিকারের দাবিতে উচ্চকিত। এরই পাশাপাশি '৬৫-এর মওলানাকে আমরা দেখি ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি জনগণকে ঐক্য ও প্রতিরোধ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে। আপাতদৃষ্টিতে অনেকের কাছেই মওলানার এই ভূমিকা স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। কিন্তু বর্তমানের আলোকে এ সত্য কি আমাদের নিকট সুপ্রতিভাত নয় যে ভারতভুক্ত অবস্থা থেকে পাকিস্তানভুক্ত অবস্থা বাংলাদেশের সত্যিকারের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন অনেক সহজসাধ্য। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রতি তাঁর আস্থা এত সুদৃঢ় ছিল যে ১৯৭০-এর শেষের দিকে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন, "স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান" না দেখার আগে আমার মৃত্যু নেই। অন্যান্য জাতীয় নেতাদের কাছে তখন পর্যন্ত যা ছিল নিছক হিস্যা ভাগ্যের দাবি, মওলানার কাছে তখন তা ছিল স্বাধীনতার দাবি।

স্বাধীন বাংলাদেশের সংগ্রাম এ দেশের বুকে কোনো কোনো বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে পারে এবং পরিণতিতে তা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী হতে পারে এই দূরদৃষ্টি মওলানা ভাসানীর ছিল। এ কারণেই

www.nagorikpathagar.org

তিনি একাত্তুরের মার্চের উত্তাল দিনগুলোতে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। এ কারণেই বোধকরি ভারতে অবস্থানকালে তাঁকে অন্তরীণ জীবন যাপন করতে হয়েছিল। তাঁর এই অন্তরীণ অবস্থার কথা ময়মনসিংহের এক সভায় '৭২ সালের মাঝামাঝিতে তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

শুধু এক্ষেত্রেই নয়, মওলানার রাজনৈতিক চেতনার প্রাগ্রসরতার প্রমাণ মিলে তাঁর রাজনৈতিক দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ক্ষেত্রেও। ১৯৫৭ সালে সীমান্ত গান্ধী গাফফার খান, আচাকজাই কিংবা মজিদ সিন্ধীর মতো যেসব সহযাত্রীদের নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁদের অনেকেই তাঁর পথ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করেছেন। মওলানা তাঁদের পথগামী হন নি। ধর্মপ্রাণতা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আলোক বিবর্জিত হওয়া সত্ত্বেও মওলানা গণচীনের মাও সেতুং-এর মধ্যেই দেখতে পেয়েছিলেন মানব মুক্তির প্রতীক। এখানেই পোশাকি বৈভবহীন মওলানার আসল বৈভব।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় পরবর্তীকালে মওলানা সম্প্রসারণবাদী ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির বিরুদ্ধে যেভাবে জনমত গড়ে তোলার কাজে অক্লান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় মওলানার দূরদৃষ্টি কত প্রখর। একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর চরিত্রের মূল উপাদানটি উপলব্ধি করা। এ সেনাবাহিনী যে একদিন আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করবে তা তিনি ১৯৭৩ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন। সে সময়ে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জনসভায় সেনাবাহিনী ও জনগণের সম্মিলিত সংগ্রামের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

দেশের বুকেও যে 'এক নেতা ও এক দলের' শাসন চিরস্থায়ী হবে না এবং এ ব্যবস্থা যে একটি কাদা মাটির পাওয়ালা দেত্য বৈ আর কিছু নয় তা তিনি এ ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের সময়েই বলেছিলেন সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধি দলের কাছে। তিনি মাত্র ছ মাস অপেক্ষা করতে বলেছিলেন! অচিরেই তাঁর এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

দেশের স্বাধীনতা বলতে তিনি কেবল মুষ্টিমেয় ধনিক বণিকের স্বাধীনতাই বুঝেন নি। স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝতেন কৃষক-শ্রমিক জনগণের স্বাধীনতা। এ কারণেই তাঁর আজীবনের সাধনা ছিল কৃষকদের সংগঠিত করা। ১৯৫৬ সালে তথাকথিত গণতান্ত্রিক নেতাদের অগ্রাহ্য করে গঠন করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি এবং ১৯৬৯-এ কৃষক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর গঠনমূলক কাজের কর্মসূচি ও খসড়া গঠনতন্ত্রে' মাওলানা ভাসানী বলেন, "মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব মানুষকে লইয়া মানুষের জন্যই অনুষ্ঠিত

www.nagorikpathagar.org

হইবে। যে মানুষের জন্য এই বিপ্লব করা হয়, তাহারা কে? তাহারা হইতেছে দেশের জনসাধারণ, যাহারা সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষিত ও নিগৃহীত হইতেছে। এই শোষণের অবসান ঘটাইয়া সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজব্যবস্থা কায়েম করিবার প্রাথমিক স্তর হিসেবে দেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন।"

মওলানা ভাসানী কখনোই সুষ্ঠু সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হন নি। কিন্তু তবুও তিনি হয়ে উঠেছেন এককভাবেই এক বিরাট সংগঠন, এক বিরাট ইন্সটিটিউশন। তাঁর এই সাফল্যের মূলে কী আছে? কারণ তিনিই তো একমাত্র নেতা যিনি বলতে পারতেন "মাটিতে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি কি কহে মাটির প্রাণ।" সাড়ে সাত কোটি মাটির প্রাণ মানুষগুলো কখন কী অবস্থায় এক বলিষ্ঠ উত্তাল জোয়ারে একাত্ম হয়ে দাঁড়াবে তা একমাত্র মওলানার অন্তর্দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হওয়া সম্ভব ছিল। এ কারণেই তিনি প্রত্যেকটি আন্দোলনেই সময়োপযোগী আহ্বান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। স্বাধীনতার ডাক, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও সর্বশেষে ফারাক্কা মিছিল তারই স্বাক্ষর বহন করে।

ইব্রাহীম খাঁ লিখেছেন, "ভাসানীর মওলানা সাহেবের কাজকর্ম দেখে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়েছে, লোকটি বাংলার কাল বৈশাখী। প্রচণ্ড তার শক্তি, ততোধিক তার বেগ। যেদিকে চলেন তাঁর দাপটে আধমরা ডাল ভাঙে জরাজীর্ণ গাছ উপরে যায়, বাসি পাতা খসে হাওয়ায় উড়ে, বুতোঘর ভূমিস্যাৎ হয়। তারপর কাল বৈশাখী কোথাও চলে যায়। নতুন ঘর তোলার দায়িত্ব অন্য লোকের, নতুন চারা লাগানোর ভার অন্য মালীর, নতুন পাতা পল্লব জাগিয়ে তোলার কর্তব্য নব বসন্তের।"

মওলানা অনেকবারই বাংলার শোষিত তৃষিত বক্ষে এই কাল বোশেখির ঝড় তুলেছেন। অনেকবারই এই ঝড়ের পর কিশলয় জাগে নি। এর জন্যে কী তিনি দায়ী ছিলেন? না, তা মোটেই নয়। তাই আগামী দিনে বাগান সাজাবার দায়িত্ব যে বাগানকারদের ওপর বর্তেছে তাঁরা যদি বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ সংগ্রামকে তার চূড়ান্ত যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছে দিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ও গণতান্ত্রিক সমাজ গড়তে সফল হন তা হলেই মওলানার ঝড় তোলা সফল হবে।

www.nagorikpathagar.org

শতাব্দীর অনন্য প্রতিভা চৌ-এন লাই

গণচীনের প্রধানমন্ত্রী ও চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির ভাইস চেয়ারম্যান চৌ-এন লাই ৮ই জানুয়ারি পিকিং-এ পরলোক গমন করেছেন। দুরারোগ্য ক্যান্সার ব্যাধি এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জীবনী শক্তিকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে ফেলছিল। অবশেষে এই কালব্যাধির প্রাণবিনাশী শক্তি এই মহামানবের প্রাণশক্তিকে পরাস্ত করেছে। সেই অপূর্ব প্রাণশক্তি একদিন স্বদেশের কোটি কোটি নিঃস্ব নিপীড়িত হতমান মানুষের মুক্তি নেশায় দুর্জয় শক্তিতে প্রতিক্রিয়ার সকল ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করতে পরাভব মানে নি—সেই প্রাণশক্তিই প্রকৃতির অমোঘ বিধানের নিকট আজ পরাজয় বরণ করেছে। এটাই মানবজীবনের শাশ্বত বিধান। এই বিধানকে অগ্রাহ্য করতে পারে—এমন সাধ্য কার আছে। নশ্বর মানবজীবনের এই অমোঘ বিধানকে দার্শনিক ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের ভাষায় বলতে হয় : 'বেচে থাকা মানে মরে যাওয়া।'

চৌ-এন লাই ৭৮ বছর বেঁচে ছিলেন। সাধারণ এশীয় মানুষের পরমায়ুর তুলনায় এক স্বাভাবিক পরিণত বয়সেই তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। আয়ুষ্কালের পরিণতির পাশাপাশি মানবজীবন ব্রতের সুমহান পরিণতি অর্জনের মহামানবতুল্য সফলতা তিনি লাভ করেছেন।

চৌ-এন লাই ছিলেন শতাব্দীর অনন্য প্রতিভা। প্রখর ইতিহাস চেতনায় প্রদীপ্ত এই প্রতিভা বর্তমান শতাব্দীর ইতিহাসের ধারাকে তার যথার্থ লক্ষ্যে প্রবাহিত করেছে। একদা ইতিহাসের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত আশি কোটি মানুষ অধ্যুষিত চীন যখন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বে জর্জরিত আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের নিগড়ে ক্ষতবিক্ষত সেই চীনকে সমকালীন বিশ্বে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করার মহান ব্রত পালনে যে কয়জন মুষ্টিমেয় ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এগিয়ে এসেছিলেন—চৌ-এন লাই তাঁদেরই একজন।

১৯৪৯ সনে গণচীন প্রতিষ্ঠার পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চৌ-এন লাই ছিলেন চীনের প্রধানমন্ত্রী। চেয়ারম্যান মাও সে তুং এর নেতৃত্বের প্রতি তাঁর আস্থা ছিল প্রশ্নাতীত। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের আলোকে চেয়ারম্যান মাও চীন বিপ্লবের দার্শনিকভিত্তি ও পথ নির্দেশ রচনা করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই বিপ্লবী সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী দিনগুলোতে আর বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পর বিপ্লবের আদর্শের পবিত্রতা সংরক্ষণ ও বিপ্লবকে অব্যাহত রাখার সুকঠিন সংগ্রামে অবিচল থাকার এক মহৎ দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন গণচীনের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য। তাঁর মৃত্যুতে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি মন্তব্য করেছে : 'পার্টি ও জনগণের প্রতি অনুগত কমরেড চৌ-এন লাই চেয়ারম্যান মাও এর সর্বহারা বিপ্লবী লাইন বাস্তবায়ন এবং চীনা জনগণের মুক্তি সংগ্রামে ও কমিউনিজমের সংগ্রামে বিজয়ের জন্য বীরত্ব ও নিষ্ঠার সাথে সংগ্রাম

www.nagorikpathagar.org

করে গেছেন এবং এই সংগ্রামে তিনি সারা জীবন নিঃস্বার্থভাবে তাঁর সমস্ত কর্মশক্তি নিয়োজিত করেন। জনগণের প্রতি এই আনুগত্যবোধই চৌকে পারিবারিক আভিজাত্যের ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে জাতি ও জনতার মুক্তি সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ পথে পাড়ি জমাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পদস্থ চাকুরে পরিবারের সন্তান চৌ-এন লাই জাপানে পাঠরত থাকাকালীন মার্ক্সবাদী দর্শনে দীক্ষা নেন। আধুনিক চীনের ইতিহাসে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মের যুগান্তকারী আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকা স্বদেশবাসীর নিকট এক প্রতিশ্রুতিবান রাষ্ট্রনায়কের ব্যক্তিত্বকে প্রতিভাত করে তোলে। প্যারিসে অধ্যয়নরত চৌ সেখানে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন করেন ১৯২১ সালের দিকে। সেদিন প্যারিসে যারা প্রবাসী কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন— পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই আধুনিক চীনের স্থপতিরূপে সুপরিজ্ঞাত হয়েছেন। ১৯২৪ সনে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তরুণ চৌ-এন লাইর ওপর যুদ্ধবাজ সামন্তভূস্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্যে কুয়োমিনট্যাং ও কম্যুনিস্টদের সমন্বয়ে গঠিত ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হোয়ামপায়া সামরিক একাডেমিতে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদানের গুরুদায়িত্ব বর্তায়। সেই থেকে জীবনের কোনো পর্যায়েই তিনি বিপ্লবী সংগ্রামের মহান দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি। সাংহাইতে শ্রমিক অভ্যুত্থান সংগঠনের দায়িত্ব পালন করতে এসে চৌকে গ্রেপ্তারি বরণ করতে হয়। তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কিন্তু অমিত সাহসে ফাঁসির রজ্জুকেঅগ্রাহ্য করে তিনি বিপ্লবী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এমনিভাবে বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার সঙ্গে বীর যোদ্ধাসুলভ জঙ্গিত্বের সমন্বয় চৌ-এন লাইয়ের ব্যক্তিত্বই সম্ভব হয়েছিল।কার্লাইলের ভাষায় : প্রতিভা হল 'কষ্টসহ্য করবার অপরিসীম ক্ষমতা।' সেই অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন বলেই চৌয়ের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ঐতিহাসিক লংমার্চের দুর্লঙ্ঘ্য ২৫০০০ লি অতিক্রম করা।

ইতিহাসের গতি প্রবাহ বোঝার ক্ষমতা ছিল তাঁর অপরিসীম। সমকালীন ইতিহাসের পরিমণ্ডলে বাস করে আগামী দিনের ইতিহাসের ধারা প্রবাহকে পরিলক্ষিত করবার ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন চৌ। তাঁর এই অন্যান্য সাধারণ প্রতিভার দ্যুতি গণচীনের রাজনৈতিক ইতিহাসে একাধিকবার লক্ষ করা গেছে। ১৯৩৬ সনে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী চিয়াং কাইশেক সিয়ানে তাঁর বাহিনীর বিরোধী মতাবলম্বীদের দ্বারা গ্রেপ্তার হলে চৌকে পাঠান হল কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে চিয়াং-এর সঙ্গে আলোচনার জন্য। কিন্তু দূরদর্শী চৌ অন্য মানুষ, অন্যব্যক্তিত্ব। একদা যিনি চিয়াং-এর হাতে বন্দি হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁর মনে মুহূর্তের জন্যও দেখা দিল না প্রতিহিংসার রোষাগ্নি। ইতিহাসের সার্থক ছাত্রের মতো পরম দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন তিনি। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে চিয়াং-এর যথার্থ স্থান মূল্যায়ন করেই প্রতিরোধ সংগ্রামে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট করার জন্য চিয়াংকে তিনি সম্মত করান। এটা নিছক রাজনৈতিক উদারতা কিংবা মহত্ত্ব নয়– এটা হল ইতিহাস চেতনার প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞার অধিকারী বলেই রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ছিলেন নির্ভুল। দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময়কালে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বাম ও দক্ষিণ বিচ্যুতির মুখে চৌ-এন লাই মাও সে তুং-এর সঠিক বিপ্লবী লাইনকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রচণ্ড রাজনৈতিক আলোড়নের মুখে চৌ-এর বাস্তব মুখিনতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা চীন বিপ্লবের অব্যাহত ধারাকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। তাই ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা হিসেবেই নয়— ইতিহাসের স্রষ্টা হিসেবে চৌ-এন লাই অমর হবেন।

পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে চৌ-এন লাই ছিলেন চীনের শীর্ষস্থানীয় প্রশাসক। গণচীনের গোড়াপত্তনের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই আশি কোটি মানুষ অধ্যুষিত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এক সুকঠিন দায়িত্ব তিনি পালন করে গেছেন। গৃহযুদ্ধ বৈদেশিক আগ্রাসন, দারিদ্র ক্লিষ্ট ও আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতার সমস্যা জর্জরিত এই দেশকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সহজসাধ্য ছিল না। একদিকে কোটি কোটি মানুষের গ্রাসাচ্ছদনের দাবি পূরণ করা, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ব্যূহকে ছিন্ন করে জাতীয় অস্তিত্বকে সংরক্ষণ করা গণচীনের জন্য ছিল এক দুরূহ কাজ। নিজস্ব সম্পদ ও জনশক্তিকে সম্বল করে চীনকে একটি আধুনিক জাতিতে রূপান্তরিত করার কাজে চৌ-এন লাই এক অসাধারণ রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাই চৌ-এর মৃত্যুতে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছে— তাঁদেরই কণ্ঠে, আদর্শের ক্ষেত্রে যাঁরা ছিলেন চৌ-এর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন যথার্থ বলেছেন: 'চৌ-এর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মত্তা, দার্শনিক চিন্তার গভীরতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ প্রজ্ঞা তাঁকে এক মহান নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বিংশ শতাব্দীর খুব কম লোকই বিশ্ব ইতিহাসকে তাঁর মতো প্রভাবিত করতে পেরেছেন।' প্রেসিডেন্ট ফোর্ডও প্রায় একই কথা বলেছেন। ফোর্ডের ভাষায় : 'তিনি ছিলেন একজন অবিস্মরণীয় নেতা। যিনি শুধু আধুনিক চীনই নয়, বিশ্ব ইতিহাসেরও বিবর্তনে রেখে গেছেন অনন্য সাধারণ অবদান।' বীরেরা ইতিহাসে সৃষ্টি করেন না– জনগণই ইতিহাসের প্রকৃত নির্মাতা। তা হলে ইতিহাসে মহাপুরুষদের স্থান কোথায়? একজন মহাপুরুষ জনগণের বিক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতারাশিকে পরিশীলিত ও পরিশ্রুত করে ইতিহাসের বিবর্তনের ধারাকে উপলব্ধি করার প্রতিভায় দীপ্ত হন। আর সেই ঐতিহাসিক ধারায় জনগণকে পরিচালিত করার কাজে ব্রতী হন। এখানেই হল ইতিহাসে মহাপুরুষদের ভূমিকা। চৌ-এন লাই সমকালীন বিশ্ব ইতিহাসে এই ভূমিকাই পালন করেছেন। গণচীনের অভ্যুদয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎশক্তি গোষ্ঠী যখন গণচীনকে বিশ্বসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে তৎপর, গণচীনের রাষ্ট্রীয় নেতা হিসেবে চৌ বৃহৎ শক্তিবর্গের নিকট কোনো সুবিধা প্রত্যাশা করেন নি। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রদত্ত সুবিধের চাইতে কয়েক বছরের আত্মনির্বাসনই তিনি শ্রেয় মনে করেছিলেন। তিনি জানতেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানবিতিহাসের চালিকা শক্তি কোথায় নিহিত। তাই ১৯৫৬ সনে ঐতিহাসিক বান্দুং সম্মেলনে আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের মধ্যে সহাবস্থানের নীতি হিসেবে পঞ্চশীলা নীতি প্রণয়ন

www.nagorikpathagar.org

করে চৌ অসাধারণ কূটনৈতিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি জানতেন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা না গেলে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করা যাবে না। আর তাদের জন্য চাই এক ন্যূনতম ঐক্যের ভিত্তি। বিশ্বের নিপীড়িত দেশ ও জাতিসমূহের ঐক্যের সনদ বান্দুং সম্মেলনে প্রণীত পঞ্চশীলা নীতির রূপায়নে চৌ-এন লাই একনিষ্ঠভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর শ্রম সার্থক হয়েছে— সার্থক হয়েছে তাঁর সনিষ্ঠ ধৈর্য। বান্দুং-এর আন্তর্জাতিকতাবোধ চীনের জাতীয় স্বার্থকে সংরক্ষিত করেছে। চৌ-এর কূটনৈতিক প্রতিভা প্রমাণ করেছে আজকের যুগে যথার্থ আন্তর্জাতিকতা কোনো দেশেরই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নয়। চৌ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সঠিক আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে পরিচালিত গণচীনের পররাষ্ট্র নীতি তৃতীয় বিশ্বের কাছে তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। এই সমুন্নত মর্যাদা বলেই গণচীন আজ বিশ্ব সভায় প্রতিষ্ঠিত। জাতিসংঘে আজ চীন তার ন্যায্য আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। সক্ষম হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করতে। বিশ্ব জনমত গণচীনের পক্ষে প্রবাহিত হওয়ায় আমেরিকা 'দুই চীন নীতি' পরিত্যাগ করেছে। পৃথিবীর দুর্বল ও ছোট ছোট জাতিসমূহের নিকট জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণের প্রশ্নে গণচীন আজ এক শক্তি ও সাহসের উৎসস্থলে পরিণত হয়েছে। গণচীনের এই মর্যাদার অন্যতম স্থপতি হলেন চৌ-এন লাই। চৌ-এন লাইর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে গিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়া বলেছেন: 'বাংলাদেশের জনগণ, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যবৃন্দ ও সকল প্রশাসনিক এজেন্সি গণচীনের সরকার ও জনগণকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন এবং সাম্প্রতিককালে আমাদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলিতে তাদের সমর্থনকে মূল্যবান মনে করেন।' বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত দেশী-বিদেশী চক্রান্তের পরিপ্রেক্ষিতে গণচীনের মূল্যবান সমর্থন আমাদের প্রেরণার উৎস, সন্দেহ নেই। এই মহান সমর্থনের জন্য বাংলাদেশের জনগণ পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী চৌ-এর নিকট বহুলাংশে ঋণী।

সমস্যা জর্জরিত ও সংঘাত সংক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে চৌ পারস্পরিক শক্তি প্রয়োগ না করে পারস্পরিক সমস্যাবলি সমাধানের নীতিকে সর্বদাই উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তাই চীন ও সোভিয়েতের মতাদর্শগত বিরোধ সত্ত্বেও চৌ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বিরোধসমূহ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুতরাং শান্তির সংগ্রামেও চৌ-এন লাই অমর অবদান রেখে গেছেন।

চৌ-এন লাই লোকান্তরিত হয়েছেন। কোনো মহাপুরুষের জীবনকালে তার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। এমনকি তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও সম্ভব নয়। চৌ-এন লাইর ক্ষেত্রেও তা সমান প্রযোজ্য। চৌ-এর দার্শনিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রজ্ঞার গভীরতা, ব্যাপকতা ও স্থায়িত্ব আগামী দিনের ইতিহাসেই মূল্যায়ন সম্ভব। তবুও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, চৌ-এন লাই এক তুলনাহীন কালজয়ী প্রতিভা। সভ্যতার ইতিহাসে তিনি অমরত্ব অর্জন করবেন।

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ

১৯৫৪ সন। পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯২-ক ধারা বলে পূর্ববাংলায় গভর্নর জেনারেলের শাসন চালু করে। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মরহুম এ, কে, ফজলুল হককে করা হয় নজরবন্দি। জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী তখন স্টকহলমে শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য দেশের বাইরে। মেজর জেনারেল ইস্‌কান্দার মীর্জাকে পূর্ব বাংলার গভর্নর নিযুক্ত করা হল। সমগ্র পূর্ব বাংলায় তখন চলছে ব্যাপক ধরপাকড় ও সন্ত্রাসের রাজত্ব। কেউ মুখ খুলতে সাহস করছে না। জেনারেল মীর্জা সদম্ভে ঘোষণা করলেন, মওলানা ভাসানী 'রাষ্ট্রের দুশমন'। দেশে ফিরে এলে তাঁকে এমন একজন সুদক্ষ বন্দুক চালক দিয়ে হত্যা করা হবে যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়।

পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই নজীরবিহীন সন্ত্রাস ও স্বৈরাচারের অজুহাত ছিল কলকাতার দমদম বিমান বন্দরে ফজলুল হক সাহেবের একটি কথিত উক্তি। মার্কিন সাংবাদিক কালাহানের একটি প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পূর্ববাংলার কমিউনিস্টদের কথিত ষড়যন্ত্র, আদমজী পাটকল ও কর্ণফুলী কাগজের কলে শ্রমিক দাঙ্গা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকার গৃহীত ব্যবস্থার প্রতি যৌক্তিকতা আরোপ করেছিল।

পূর্ব বাংলার জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্যে হাজার হাজার প্রচারপত্রে দেশকে ছেয়ে ফেলা হল। প্রচারপত্রের ভাষা ছিল, গুজবে কান দেবেন না,'শত্রুর প্রচারে কান দেবেন না...' 'প্রাদেশিকতার বিষময় প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না'– ইত্যাদি।

পূর্ব বাংলায় ৯২-ক ধারার অমানিশা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। যুক্তফ্রন্টের ভাঙন সম্পন্ন হলে তা প্রত্যাহার করা হয়। এক পর্যায়ে ফজলুল হক সাহেব কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

রাষ্ট্র বিরোধী জননেতা বরিত হলেন রাষ্ট্রের সব চাইতে স্পর্শকাতর ও সাধারণের কাছে অপ্রবেশ্য মন্ত্রণালয়ের কর্ণধার রূপে। রাষ্ট্রীয় স্তরে মওলানা ভাসানীর পুনর্বাসন তখনো হয় নি। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের আমলে তিনি আবার বন্দি হলেন। পাকিস্তানের শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার অভিযোগ আনা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে। একথা সত্যি যে, সামরিক শাসন জারি হওয়ার কিছুকাল পূর্বে তিনি মিসর সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি আধুনিক মিসর ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা পরলোকগত প্রেসিডেন্ট জামাল নাসেরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিতে মিসরের মতো একটি মুসলিম রাষ্ট্রে মওলানা ভাসানীর এই সফর ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল।

www.nagorikpathagar.org

ইতোমধ্যে সিন্ধু ও পদ্মায় অনেক জল গড়িয়ে গেছে। '৬৫-এর সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র কবে ১৭ দিন ব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে গেছে। মওলানা ভাসানী যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সফরে গেলেন। সেখানকার এক সেনা ছাউনিতে তাঁকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় গার্ড অব অনার দেওয়া হল। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে এ এক নজীরবিহীন ঘটনা। ক্ষমতা বহির্ভূত একজন সরকার বিরোধী নেতা যিনি বহুকাল রাষ্ট্র বিরোধী হবার গ্লানিও বহন করেছিলেন তাঁকেই রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী দিল গার্ড অব অনার। রাষ্ট্রতত্ত্বের ক্ষেত্রে ফজলুল হক সাহেবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়া ও মওলানা ভাসানীর গার্ড অব অনার লাভ গভীর তাৎপর্য বহন করে।

আধুনিক রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতি সম্পর্কে যাঁরা অবগত তাঁরা জানেন, এ দুটি ঘটনার কোনোটিই সম্ভব হত না যদি এর পেছনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গোয়েন্দা সংস্থার অনুমোদন না থাকত। গোয়েন্দা সংস্থা, সরকারি নেতৃত্ব ও জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কী, কীভাবে তা নির্ধারিত হয়, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র কীভাবে কাজ করে এবং জনজীবনে গোয়েন্দা সংস্থার উপস্থিতি কীভাবে ও কতটুকু অনুভূত হবে তা নির্ভর করে একান্তভাবেই ঐতিহাসিক বাস্তবতার ওপর। সাম্প্রতিক কালে কিসিঞ্জারের স্মৃতিকথা প্রকাশের পর বিদ্বৎসমাজ জানেন কীভাবে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে আসীন কর্মকর্তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখেন। আধুনিক রাষ্ট্রে এসব এখন অনেকটা খেলার স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা অনেকটা প্রকট হয়ে ওঠে যখন আমরা দেখি কখন কি অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ দেশপ্রেমিক অথবা দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে তা নিরূপণকারী বিবেচনাসমূহ জনগণকে কখনোই জানতে দেওয়া হয় নি। এই বিবেচনাগুলোরই নাম হল 'অফিসিয়াল সিক্রেট' কিংবা 'ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টস।' কোন কোন তথ্য ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টসের অন্তর্গত হবে তা নির্ধারণ করেন মুষ্টিমেয় সংখ্যক আমলা যাঁরা কোনোক্রমেই তাদের কার্যকলাপের জন্য জনপ্রতিনিধিদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। রাষ্ট্র যে শেষ বিচারে মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত একটি কাঠামো বিশেষ এবং নির্বাচিত সংস্থাগুলো তাকে কেবলমাত্র মিথ্যে গৌরবে অলঙ্কৃত করে—'ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টস্' গুলোকে সযত্নে ও সাবধানতার সঙ্গে জনচক্ষু থেকে আড়াল করার ঘটনা আংশিকভাবেও হলেও তা প্রমাণ করে। স্নায়ুযুদ্ধ কবলিত এই বিশ্বে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বৈরিতার এই যুগে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা পরিধি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকবে তা তো স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক সময় এসব গোপন তথ্য যে পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয় তার ভিত্তি এতই দুর্বল ও হাস্যকর যে, তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যয়িত বিপুল সম্পদ ও অর্থ নাগরিকদের ওপর অর্থহীন করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। ১৯৭১ সনের পূর্ব পর্যন্ত চীন-মার্কিন

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত তিক্ত। চীনের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলি সম্পর্কে মার্কিন শাসকমহলে কৌতূহল ছিল অপরিসীম। কারণ এসব ঘটনাপ্রবাহ সঠিকভাবে জানতে পারার ওপরই নির্ভর করছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন রণনীতি কীভাবে নির্ধারিত হবে। এ কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হংকং-এ একটি শক্তিশালী দূতাবাস গড়ে তুলেছিল। এই দূতাবাসের প্রধান কাজই ছিল চীন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ। এমন সব খুঁটিনাটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হত যা হাসির উদ্রেক না করে পারে না। মার্কিন এজেন্টরা প্রতিনিয়ত চীনের অভ্যন্তরে থেকে হংকং সীমান্তে আগত ট্রেনের চাকার ব্যাসের পরিমাপ গ্রহণ করত এবং তা সযত্নে রেকর্ড করত। বছরের কোন সময়ে ট্রেনের চাকার ব্যাসে স্বাভাবিক মাত্রার বেশি ক্ষয় থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত যে ঐ সময়ে চীনের অভ্যন্তরে সৈন্য চলাচল স্বাভাবিক মাত্রার বেশি হওয়াতেই ট্রেনের চাকাগুলো বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে এবং এ থেকেই আঁচ করা হত চীনের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে গেছে। ট্রেনের চাকার ক্ষয়ের পেছনে আরো অনেক রকম কারণ থাকতে পারে তা চীন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ভাববার অবকাশ কোথায়? আজকাল অবশ্য স্যাটেলাইট প্রযুক্তির ব্যবহার স্ট্রাটেজিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নতুন পরিপ্রেক্ষিত যুক্ত করেছে। মানবিক উপাদান বিবর্জিত প্রযুক্তি নির্ভর স্ট্রাটেজিক তথ্যও যে কত বিভ্রান্তিকর হতে পারে তার প্রমাণ তো আমরা ভিয়েতনামে মার্কিন পরাজয় থেকে বুঝতে পারি। বহুল আলোচিত হো চি মিন ট্রেইল ভিয়েৎকং সমাবেশের ওপর বোমা বর্ষণের জন্য ভূ-উপগ্রহের সংকেত ব্যবহার করা হত। বনাঞ্চলে গেরিলা সমাবেশ ঘটার লক্ষণ হিসেবে ধরে নেওয়া হত যে সেখানকার বায়ু বলয়ে কার্বন-ডাই অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ভূ-উপগ্রহের ফটোগ্রাফির মোজাইক বিশ্লেষণ করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিন নৌবহরকে মুহূর্তের মধ্যে নির্দেশ দেওয়া হত নির্দিষ্টস্থলে আঘাত হানার জন্য। নির্দেশ পাওয়া মাত্র মার্কিন বি-৫৭ বোমারু বিমানগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে গিয়ে হাজার হাজার টন বোমা নিক্ষেপ করে ফিরে আসত। এতৎসত্ত্বেও মার্কিন পরাজয় রোধ করা যায় নি। এইসব ব্যর্থতা থেকেই মার্কিন জনগণ অনুভব করতে থাকেন এসকল সিদ্ধান্তের ভার এককভাবে গুটিকতক গোয়েন্দা আমলার খেয়ালের নিকট সমর্পণ করা যায় না। E. P. Thompson তাঁর "Review of Security and the State গ্রন্থে লিখেছেন "In the United States we have witnessed three decades of the frightening enlargement of agencies of 'security' (including massive espionage, provocation, 'dirty tricks' and possibly even assassinations, committed against their own citizens); but this has at length been met, by the American liberal tradition, in a very vigorus

www.nagorikpathagar.org

counter attack, in which some journalists and lawyers have played an honourable part. Without this counter attack which included the massive leakages' and then the legally enforced disclousure of 'secret' documents and tapes, the mountain of official excreta known as 'Watergate' would never have been exposed to public view. And it is now possible, under the US Freedom of Information Act, for victims of these organs (such as Alger Hiss or the Rosenbergs) to gain access to some part of the documentation necessary for their vindication." সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশেই প্রশাসনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে আলাদা করে ভাবা হয় না বলে নাগরিক অধিকার বা আইনের শাসনের প্রসঙ্গটি আলোচনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যখন অস্থিরতা থাকে না তখন প্রায়শই আমরা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বিষয়টি বিস্মৃত হই। কোনো কারণে রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলেই বোঝা যায় রাষ্ট্রের মধ্যেও 'রাষ্ট্র' আছে। আর্জেন্টিনায় আলফোন্‌সিন সরকারের আমলেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অতীতে কীভাবে সেখানে মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছিল।

সাম্প্রতিক কালে অনেক রাষ্ট্রেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের রাষ্ট্রটি নিজের অস্তিত্বকে আর আড়াল করে রাখছে না। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দৈনন্দিন বিষয়াদি নিয়ে জনসংযোগ রচনা করা, লবি করা, মত বিনিময় করা এর কর্মকৌশলের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণ এখন বুঝতে পারছে সরকারি কর্মকর্তা (মন্ত্রী পরিষদ কিংবা রাষ্ট্র প্রধান) পরিবর্তিত হলেও রাষ্ট্র তার নিজ নিয়মেই প্রাতিষ্ঠানিক পারস্পর্য রক্ষা করে চলে। গণ অসন্তোষ তাই অনেক ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণের চৌহদ্দিতে রাখা সম্ভব। এতে করে সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা অধিকতর হারে নিশ্চিত হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যাপক আবু মাহমুদকে যেমন দেখেছি

প্রফেসর আবু মাহমুদ লোকান্তরিত হয়েছেন—প্রতিবেশী দেশে থেকেও এ সংবাদটি আমি অনেক দেরিতে পেয়েছি। গত নভেম্বরের শেষ দিকে আফ্রো এশীয় গণসংহতি সম্মেলনে এসেছিলেন বাংলাদেশের বেশ কজন প্রতিনিধি। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, সংবাদ সম্পাদক আহমেদুল কবির, ডা. সাইদুর রহমান, বাকশাল নেতা মোনায়েম সরকার, ওয়ার্কার্স পার্টি নেতা হায়দার আকবর খান রনো এঁদের অন্যতম। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমার বন্ধু ড. মুক্তাদার সঙ্গে টেলিফোন সংলাপে আমাকে স্মরণ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই আমি ২৮শে নভেম্বরে কণিস্ক হোটেলে যাই। তিনিই আমাকে জানালেন তাঁদের প্রতিনিধি দলে ওয়ার্কার্স পার্টি নেতা হায়দার আকবর খান রনোও রয়েছেন। রনো ভাই-এর সঙ্গে আমি যখন পেরেস্ত্রোইকা—গ্লাসনস্ট ও আমার বর্তমান গবেষণাসহ নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তারই প্রসঙ্গান্তরে এসে গেল বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ওয়াহিদুল হকের অর্থমন্ত্রী হিসেবে যোগদানের বিষয়টি। রনো ভাই জানতে চাইলেন, প্রফেসর ওয়াহিদুল হকের বিশ্ব ভাবনা কী? প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিত ব্যক্তির একটা বিশ্ব ভাবনা থাকবে---তা আশা করাটা অযৌক্তিক নয়। কথায় কথায় তিনি জানতে চাইলেন, ওয়াহিদুল হক সাহেবের চিন্তা ভাবনা কি আবু মাহমুদের মতো? আলোচনা আর বেশি দূর না এগোতেই তিনি আমাকে বিনা মেঘে বজ্রাহত করে জানালেন, 'জানো তো, ড. মাহমুদ মারা গেছেন।' এই আমার প্রথম জানা আমাদের অনেকের প্রিয় শিক্ষক ড. আবু মাহমুদ আমাদের ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছেন। এ যেন বড্ড অভিমান করে নিরুদ্দেশ হওয়া।

কী বা এমন বয়স হয়েছিল প্রফেসর মাহমুদের। ষাট থেকে সত্তরের মাঝামাঝি পর্যায়ে তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। চলে গেলেন ধীরে ধীরে একান্ত নিঃসঙ্গ লোকে অন্তর্হিত হয়ে। তার মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ করে এর অর্থনীতি বিভাগের অগ্নিযুগের অবসান হল।

আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ষাটের দশকে যে উত্তাল তরঙ্গ উঠেছিল, যা আশির দশকে হাজারো বুদ্বুদের ফেনিল সমারোহ সত্ত্বেও নিস্তরঙ্গতায় পর্যবসিত—প্রফেসর মাহমুদের অভ্যুত্থান ও তিরোধান সেই প্রক্রিয়ারই প্রতিবিম্ব। আমি ও আমার সহপাঠীরা অনেকেই প্রফেসর মাহমুদের উল্কাসম উত্থানের কালটির সাক্ষ্য বহন করে চলেছি। ১৯৬৩ সনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অনার্স ক্লাসে ভর্তি হই। সে সময়টায় এই বিভাগটি উজ্জ্বল সব জ্যোতিষ্কের ছটায় জ্বল জ্বল করছিল। প্রফেসর নূরুল ইসলাম বিভাগীয় প্রধান ও

www.nagorikpathagar.org

প্রফেসর। তা ছাড়া রয়েছেন ড. আবু মাহমুদ, আনিসুর রহমান, অধ্যাপক রেহমান সোবহান। কিছুদিনের মধ্যে আমেরিকা থেকে ফিরলেন ড. মুজাফফর আহমদ। এ ছাড়া আরো ছিলেন কতিপয় প্রতিভাবান তরুণ শিক্ষক। হাসনাত আব্দুল হাই, মহিউদ্দিন খান আলমগীর, মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, মির্জা আজিজুল ইসলাম, সাদরুল আমিন লতিফুর রেজা ও মীর্জা মোজাম্মেল, ড. শাহজাহানসহ আরো অনেকে। এঁদের সকলেই ছিলেন নিজগুণে বিশিষ্ট।

'৬২ এর শিক্ষা আন্দোলনের পটভূমিকায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সূচনা। '৬২তে আন্দোলন হয়েছিল দুই পর্বে। আন্দোলনের প্রথম পর্ব ছিল আইয়ুবের সামরিক শাসন ও স্বৈরাচার বিরোধী জঙ্গি বিস্ফোরণ। দ্বিতীয় পর্ব সূচিত হয়েছিল প্রফেসর শরীফের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে। বস্তুত ঐ সময়টায় আমরা ছিলাম কলেজের ছাত্র। ঐ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার চিন্তা-ভাবনার কথা আমাদের মতো তরুণদের কানেও পৌঁছেছিল। ব্যাপারটি তখনো ছিল চিন্তা-ভাবনার পর্যায়ে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রাজনৈতিক আলোচনায় স্বাধীনতার ভাবনাটি স্থান পেত। পরবর্তীকালে শুনেছি, বিষয়টি নিয়ে সামরিক শাসনের মধ্যেও আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আলোচনা করেছিলেন। আমাদের তরুণ মনে এসব ভাবনার কথা বেশ দাগ কেটেছিল।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম বর্ষে ড. আবু মাহমুদ আমাদের মাইক্রো ইকনমিক থিওরি পড়াতেন। তাঁর লেকচারের কাঠামো কখনোই পাঠ্য-পুস্তকি ছকে আবদ্ধ থাকত না। থিওরি পড়াতে গিয়ে নিওক্লাসিকেল অর্থনীতির অসারত্ব ও এর এসামপশনগুলোর বাস্তবতা থেকে দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলতে তিনি কখনো বিরত হতেন না। তিনি একটা কথা বারবার উচ্চারণ করতেন, তা হল, 'You are to unlearn what you have learnt' আমরা জানি প্রত্যেক শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে থাকে একটি বিশ্বভাবনা। আমরা এতকাল যা শিখেছি, তা যে নিছক বুর্জোয়া–সামন্ত মতাদর্শকে মগজে ও মনে গভীরভাবে প্রোথিত করবারই একটা প্রয়াস–একথাই তিনি বারবার আমাদের মনে করিয়ে দিতেন। জগৎ ও জীবনকে নতুন করে বুঝতে ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে, জীর্ণ পুরাতন চিন্তা-ভাবনাগুলোকে মনের রাজ্য থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে–সেটাই ছিল তাঁর মূল আবেদন। তাঁর ছাত্র হিসেবে আমরা তা কতটুকু করতে পেরেছি তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তবে আমাদের মধ্যে তিনি যে একটি জিজ্ঞাসু মনের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি প্রায়শই বলতেন, সন্দেহই হচ্ছে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের তথা সত্যানুসন্ধানের চাবিকাঠি। একথাটি তিনি বলতেন মনীষী ডেকার্টের বয়াত দিয়ে। বস্তুত তাঁর প্রতিটি বক্তৃতাই ছিল দর্শন, অর্থনীতি শাস্ত্রের ইতিহাস ও 'স্ট্যান্ডার্ড প্যারাডাইমে'র ক্রিটিকের একটি সমন্বয়। এ ধরনের লেকচার মাঝারি গোছের ছাত্রদের জন্য তেমন উপযোগী ছিল না–কারণ পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে

www.nagorikpathagar.org

এসব বক্তব্যের সমন্বয় সাধন দুরূহ হয়ে দাঁড়াত। ভালো ছাত্ররা লাইব্রেরিতে পড়াশুনা করে পাঠ্যপুস্তক থেকে যা কিছু জানবার তা জেনে নিত। ড. মাহমুদের বক্তৃতা ছিল তাদের জন্য উপরি পাওনা। তাই বলে তিনি যে পাঠ্য বিষয়গুলোর ওপর মোটেও নজর দিতেন না তা নয়। অর্থনীতি শাস্ত্রের বিষয়বস্তু, চাহিদা সূত্রের বিশ্লেষণ ও তার ব্যতিক্রম, স্থিতি-স্থাপকতার নানাসূচক, স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় রেখার গঠন ও বৈশিষ্ট্য, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার, একচেটিয়া বাজার, প্রান্তিক উৎপাদিকা তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ, খাজনা ও পুঁজির তত্ত্ব ইত্যাদি তিনি বিস্তারিতভাবেই পড়িয়েছিলেন। মার্ক্স, জোয়ান রবিনসন, কালেকি, মরিস ডব, মরিস কর্নকোর্থ, পল সুইজি, পল ব্যারান কিংবা রজনী পাম দত্তের কথা সুযোগ পেলেই তিনি আলোচনা করতেন। পুঁজিবাদী বাজারের নৈরাজ্য ও ব্যর্থতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাফল্যগুলোর কথা তুলে ধরতে ভুলতেন না তিনি। অনুন্নত বিশ্বের সমস্যা সমাধানে সমাজতন্ত্রের সার্থকতা সম্পর্কে আমাদের মনে যে প্রতীতি জন্মেছিল–তার অনেকাংশের জন্যই আমরা ড. মাহমুদের নিকট ঋণী। এ প্রসঙ্গে তিনি চীন ও ভারত সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করতেন। তৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির পাঠ্যক্রম ছিল অত্যন্ত সেকেলে। রাজনৈতিক অর্থনীতি, মার্ক্সবাদী অর্থনীতি কিংবা তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নয়নের সমস্যার ওপর তেমন কিছুই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। পাঠ্যক্রমের এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর ওপর দখল থাকলে যে সবকিছুই শ্রেণীকক্ষের আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায় ড. মাহমুদ তা অত্যন্ত সার্থকভাবে প্রমাণ করেছিলেন।

ড. মাহমুদ তাঁর চিন্তা-ভাবনাকে কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাইতেন না। তিনি চাইতেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও জনগণের মধ্যে একটা সেতুবন্ধ রচনা হোক। প্রফেসর নুরুল ইসলাম পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সের প্রধান হিসেবে করাচি চলে যাওয়ার পর ড. আবু মাহমুদ অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হন। বস্তুত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. করে আসার পর তিনি রিডার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। বিভাগের দায়িত্ব হাতে নেবার পর কয়েক মাসের মধ্যে তিনি ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীরা বিভাগের উদ্যোগে একটি অর্থনৈতিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বিভাগের ছাত্ররা শত শত চার্ট ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির চিত্রটি জনগণের মধ্যে তুলে ধরেন। প্রদর্শনী চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শক ভিড় করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনেক্স ভবনে। অর্থনীতি বিভাগ তখন এই সদ্যনির্মিত ভবনটিতেই ছিল। বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেরাই বিভিন্ন সরকারি সূত্র থেকে চার্ট ও ডায়াগ্রামের উপযোগী করে উপাত্ত প্রস্তুত করে নেন। অর্থনীতির মতো নিরস বিষয়ও যে জনমনে সাড়া জাগাতে পারে ও ব্যাপক জনগণকে কৌতূহলী করে তুলতে পারে '৬৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ আয়োজিত অর্থনৈতিক প্রদর্শনী তারই প্রমাণ।

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শনীর পাশাপাশি সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এই সেমিনারে ড. আবু মাহমুদ ও অধ্যাপক রেহমান সোবহানসহ আরো কয়েকজন পেপার পড়ে ছিলেন। পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্যের আলোচনার পাশাপাশি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য সমাজতন্ত্র যে অপরিহার্য—একথাই ছিল এসব প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রদর্শনী ও সেমিনারে ব্যাপক দর্শক ও শ্রোতার সমাগম প্রমাণ করল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ এ দেশের জনচেতনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে অর্থনীতি বিভাগের এই ভূমিকা ক্রমান্বয়ে নিস্তেজ হয়ে আসে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রফেসর আনিসুর রহমানের উদ্যোগে সোস্যালিজম সেমিনার, গ্রাম উন্নয়ন উদ্যোগে ছাত্রদের অংশগ্রহণ ও '৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ তৎপরতায় যোগদান করে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় প্রভৃতি কর্মকাণ্ড বাদ দিলে দেশের ব্যাপক জনতার সংগে বিভাগের যোগসূত্র ক্রমান্বয়ে শিথিল হতে থাকে।

উল্লেখ্য যে, ড. আবু মাহমুদ অর্থনীতি বিভাগের প্রধান থাকাকালীন সময়ে খ্যাতিমান ক্যামব্রিজ অর্থনীতিবিদ জোয়ান রবিনসন গণচীন সফর থেকে দেশে ফেরার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সেবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগে গণচীনের কমিউন ব্যবস্থার ওপর একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা ছিল, চীনের কমিউন ব্যবস্থা সারা পৃথিবীর জন্য অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের সেরা দৃষ্টান্ত। জোয়ান রবিনসনের এই সফর আমার মতো অনেক ছাত্রকেই অনুপ্রাণিত করে। ড. আবু মাহমুদ আমাদের জোয়ান রবিনসনের লেখা ইকনমিক্স অব ইমপারফেক্ট কমপিটিশন, ইকনমিক ফিলসফি এবং এন ইনট্রোডাকশন টু মার্ক্সিয়ান ইকনমিক্স পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর মতে জোয়ান রবিনসনের 'ইকনমিক্স অব ইমপারফেক্ট কমপিটিশন' ও চেম্বারলেনের 'মনোপলিসটিক কম্পিটিশন' গ্রন্থ দুটো পশ্চিমা অর্থনীতি শাস্ত্রের জগতে এক বিরল ও ব্যতিক্রমী ধারা—সুতরাং অর্থনীতির সকল ছাত্রের জন্য গ্রন্থ দুটো অবশ্য পাঠ্য। বলতে গেলে আমাদের কালে অর্থনীতির ছাত্ররা এই বই দুটো অনেকটা আগাগোড়া পড়ে ফেলত। এগুলোর কতটা আমরা বুঝতে পেরেছিলাম, পরিমাপ করা মুশকিল। কিন্তু মৌলিক গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হতে ড. আবু মাহমুদের মতো শিক্ষকরা যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

হার্ভার্ড থেকে দেশে ফেরার পর ড. আবু মাহমুদ অর্থনীতির নানা প্রসঙ্গ নিয়ে স্থানীয় পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। বাংলা ভাষার ওপর দখল ছিল না বলে তাঁকে ইংরেজি মাধ্যম ব্যবহার করতে হত। তাঁর ইংরেজি ছিল অত্যন্ত কাব্যিক ও আলঙ্কারিক। ছিল একটা নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি। পড়লেই বুঝা যেত এটা ড. আবু মাহমুদের লেখা। ষাটের দশকের শুরুতে সালাহ্ উদ্দীন মোহাম্মদ সম্পাদিত ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

টাইমস পত্রিকায় অর্থনীতির নানা প্রসঙ্গে ড. আবু মাহমুদ নিয়মিত লিখতেন। সেকালে সাপ্তাহিক হলিডে আমাদের সাংবাদিকতায় এক ব্যতিক্রমী ধারার সৃষ্টি করে। ড. মাহমুদ সাপ্তাহিক হলিডের জন্য একাধিক শক্তিশালী প্রতিবেদন রচনা করেছেন। পাকিস্তানি অর্থনীতির মৌলিক দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যবাদী বিশেষ করে মার্কিন সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতার বিপদ সম্পর্কে তিনি পাঠকবর্গকে বারবার হুঁশিয়ার করেছেন। মানের দিক থেকে লেখাগুলো নিছক জনপ্রিয় কলাম রচনা ছিল না—যুক্তি ও তথ্যের ঋজুতা ও দৃঢ়তা ঐসব প্রতিবেদনগুলোকে সুগভীর একাডেমিক মান দান করেছিল। তৎকালীন পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকায় 'পলিটিক্যাল ইকনমি অব প্যাট্রোনেজেস', 'ম্যালথাস স্টেজেস এ কামব্যাক' এবং 'বাজেট অ্যান্ড দি পিপল' শিরোনামে সিরিজ আকারে তিনি প্রবন্ধাবলি প্রকাশ করেছিলেন। আমার ধারণা এ প্রবন্ধগুলি আমাদের অর্থনীতি শাস্ত্রের গবেষণায় মৌলিক অবদান হিসেবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে।

আমাদের দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব গঠনে ড. আবু মাহ্মুদ এর অবদান অসামান্য। ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীরা (মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে এবং নেপথ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি এম-এল) 'ডলারের বন্ধন ছিন্ন কর' আন্দোলনের সূচনা করে।

এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যের স্বরূপের ওপর এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছিল। মওলানা ভাসানী ঐ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। ড. আবু মাহ্মুদ ঐ সেমিনারে 'ডলার সাম্রাজ্যবাদ' (শিরোনামটি আমার ঠিক মনে নেই–তবে এই ধরনের কিছু হবে) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ হাজির করেন। প্রবন্ধটি তৎকালীন সাপ্তাহিক জনতায় বাংলায় প্রকাশিত হয়। মূল প্রবন্ধটি ইংরেজিতে রচনা করা হলেও সাপ্তাহিক জনতার জন্য এটির বাংলা অনুবাদ রচনা করার দায়িত্ব আমার ওপর বর্তায়। প্রায় কাছাকাছি সময়ে তিনি নারী স্বাধীনতার ওপরও একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এটি রোকেয়া হল বার্ষিকীতে প্রকাশিত হয়। এটিও ইংরেজিতে রচিত হয়েছিল এবং আমি এর বাংলা অনুবাদ করেছিলাম।

শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করার পর ড. আবু মাহমুদ তাঁকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে অপেক্ষা করার অনুরোধ জানান। শেখ মুজিবুর রহমান সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন নি। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন ছয় দফার দাবিতে হরতাল ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবার পর ছয়দফা আন্দোলনের প্রতি ড. মাহমুদ খানিকটা দরদি হয়ে ওঠেন। এই আন্দোলনের প্রতি চীনপন্থী বামপন্থীদের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। ৭ই জুনের হরতালের দিন তিনি তাঁর বিভাগীয় অফিসে আমার কাছে চীনপন্থীদের ভূমিকায় উষ্মা প্রকাশ করেন এবং

www.nagorikpathagar.org

ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, চীনপন্থীরা রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ড. আবু মাহমুদের এই ভবিষ্যদ্বাণী সর্বাংশে সত্য না হলেও একথা সত্য যে, এই রাজনৈতিক গোষ্ঠীটি পরবর্তীকালে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যথেষ্ট মূল্য দিয়েছিল। তদানীন্তন পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক অসামঞ্জস্য, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে একজন বিদ্রোহী বুদ্ধিজীবী হিসেবে ড. আবু মাহমুদের ভূমিকা শাসকগোষ্ঠীকে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার জন্য এক সুপরিকল্পিত ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জনাব আব্দুল মোনায়েম খানের এ ব্যাপারে হাত ছিল বলে অনেকেই মনে করেন। এক পর্যায়ে উপাচার্য ড. এম ও গণির নেতৃত্বাধীন প্রশাসন ড. কে টি হোসেনকে ড. আবু মাহমুদের চাইতেও বেশি বেতন দিয়ে বিভাগের রিডার পদে নিয়োগ করেন। এতে ড. আবু মাহমুদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। তিনি এই প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুনসেফের আদালতে মামলা দায়ের করেন। মামলার এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আদালতের ইনজাংকশন অগ্রাহ্য করলে আদালত অবমাননার ঘটনা ঘটে। বিচারপতি মুর্শেদের নেতৃত্বে গঠিত হাইকোর্টের এক বেঞ্চ ড. এম ও গণিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ও ট্রেজারারকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন। রায়ে এঁদের ওপর বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড ও জরিমানা ধার্য করা হয়। অবশ্য এঁদেরকে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করার সুযোগ প্রদান করা হয়। রায়ের দিন হাইকোর্ট ভবন জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। সকাল থেকেই চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ড. আবু মাহমুদ তাঁর ফিয়াট গাড়িটি নিয়ে হাইকোর্টে আসেন। সরকার সমর্থক জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (NSF) এর গুণ্ডারাও হাইকোর্টে আসে। তারা এক পর্যায়ে ড. আবু মাহমুদের গাড়ির ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে। তাঁর গাড়ির ওয়াইপার ভেঙে ফেলা হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আরো ক্ষতিসাধন করা কিন্তু সমবেত জনতার মনোভাব দেখে তারা নিবৃত্ত হয়। হাইকোর্টের রায় ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ড. আবু মাহমুদ নিজে গাড়ি চালিয়ে ফুলার রোডের বাস ভবনের দিকে রওয়ানা হন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গাড়ি গ্যারেজে রাখার সময় তিনি কুখ্যাত এন এস এফ গুণ্ডা পাচপাত্তু, খোকা আলতাফ, জাহাঙ্গীর ফয়েজ ও অন্যান্যের আক্রমণের শিকার হন। গুণ্ডারা তাঁকে মশারির স্ট্যান্ড ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে বেদমভাবে প্রহার ও জখম করে। মশারির স্ট্যান্ডে গাঁথা পেরেক ঠুকে তাঁর সর্বাঙ্গ জর্জরিত করা হয়। তিনি তাঁর গরম কোটটি দিয়ে কোনোক্রমে মাথাকে আঘাত থেকে বাঁচান। তার এমনই দুর্ভাগ্য যে, ঠিক ঐ সময়টায় অকুস্থলে কেউ ছিল না। তবে চিৎকার শুনে পার্শ্ববর্তী সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলের ছাত্র ও অন্যান্য শিক্ষকরা ছুটে আসেন। দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশ ব্যাপী প্রচণ্ড উত্তেজনা ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ড. ওসমান গণির পদত্যাগের দাবিতে ছাত্রসমাজ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সরকার পন্থী ছাত্র

www.nagorikpathagar.org

সংগঠন এন এস এফের সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে উত্তেজিত ছাত্ররা ড. এম ও গণির বাস ভবনে হামলা চালায়। ড. আবু মাহমুদ চিকিৎসার জন্য বিশদিন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকেন। বিশদিনের মাথায় তাঁকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হয়। কারণ, কোনো জখম ও আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ২১ দিন চিকিৎসা করানো হলে তা আইনের দৃষ্টিতে হত্যাপ্রচেষ্টার শামিল বলে গণ্য হয়। উপরের মহলের চাপে অপরাধীদের অপরাধ লঘু প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশ দিনের মাথায় হাসপাতাল থেকে রিলিজ করে দেন।

ড. মাহমুদের উপর হামলাকারীদের বিচার হয় নি। বিচার তো হবার কথাও নয়। যারা হামলা করেছিল তাদের পেছনে ছিল সর্বোচ্চ মহলের উসকানি ও আশীর্বাদ। কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম, সে নিজস্ব রীতিতে তার বিচার করেছে। পাচপাত্তু ১৯৬৮ সালে নিহত হয়। আর ১৯৭০ এর কোনো এক সময়ে মাহবুব সাত্তার খোকার লাশ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পড়ে থাকতে দেখা যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় গভর্নর মোনায়েম খান মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হন। উল্লেখ্য যে, দেশব্যাপী ড. আবু মাহমুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে আন্দোলনের সময় শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন যে, ড. মাহমুদের উপর হামলাকারীরা লাটভবনে আশ্রয় নিয়েছে। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য ওরা লাটভবনেই আশ্রয় নিয়েছিল।

ড. আবু মাহমুদ বনাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই মামলা পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালেও শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ড. ওসমান গণি ও অন্যান্যরা দণ্ড থেকে মওকুফ পান। তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সরাসরি হস্তক্ষেপে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের রায় খারিজ করে দেয়। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান ন্যাশনাল এসেম্বলির ঢাকা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য জুলফিকার আলী ভূট্টো ঢাকায় আসেন। সে সময় বুড়িগঙ্গায় এক নৌবিহারে ভূট্টো ড. আবু মাহমুদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। নৌবিহারে আলাপের সময় ভূট্টো ড. আবু মাহমুদকে আইয়ুব খানের এই হস্তক্ষেপের কথা জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা দুঃসহ হবে মনে করে ড. আবু মাহমুদ দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৬৬ এর শেষ দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে তিনি ব্যাঙ্ককে ইকাফের এক চাকুরিতে যোগদান করেন। বেশ কবছর ইকাফেতে কাজ করার পর তিনি কুয়েতের আরব ইনস্টিটিউটে কিছুকাল কাজ করেন। সেখান থেকে তিনি লিবিয়ার গাদ্দাফী সরকারের জেনারেল ইকনমিস্ট পদে যোগদান করেন। সেখানে কয়েক বছর কাজ করার পর ১৯৭৬ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। একটানা দশ বছর প্রবাস জীবন যাপনের পর তাঁর দেশে প্রত্যাবর্তন।

www.nagorikpathagar.org

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাঁকে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে প্রফেসরের বিশেষ পদ প্রদান করে। অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদেই বহাল থাকেন। দেশে ফেরার পর তিনি বামতত্ত্বের ওপর গবেষণায় হাত দেন। এন এপ্রোচ টু সোশ্যাল রিয়ালিটি শিরোনামে একটি বিশাল প্রবন্ধ রচনা করেন। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর স্যোশ্যাল ষ্টাডিজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময়টা তিনি গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও বি আই ডি এস গ্রন্থাগারে প্রতি দিনই তিনি দীর্ঘক্ষণ পড়াশোনা করতেন। তাঁর এই গবেষণা ধর্মী অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছিল মার্ক্সবাদের ওপর একটি বিশাল গ্রন্থ রচনা। তিনি জেদ ধরে ছিলেন, কাজটা তিনি বাংলা ভাষাতেই করবেন। তাই পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চাও চলল। দীর্ঘ কয়েক বছরের সাধনায় তিনি রচনা করলেন মার্ক্সীয় বিশ্ববীক্ষা (৫ খণ্ডে)। রচনা করলেন আরো একটি গ্রন্থ, যার শিরোনাম 'উন্নয়ন উচ্ছাস ও তৃতীয় বিশ্ব'। এ ছাড়া তিনি ধর্মের ওপরও একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একই সময়ে তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, বাংলাদেশে অর্থনীতি সমিতির সেমিনার, বি আই ডি এস এর বিভিন্ন সেমিনার ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ থেকে প্রকাশিত জার্নালের জন্য বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলির একটি সংকলন 'এসেজ অন পলিটিক্যাল ইকনমি' শিরোনামে তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র এস জীশান হোসেন গ্রন্থনা করেছিলেন। এই পাণ্ডুলিপিটি ছাপা হয়ে যখন বাঁধাইর অপেক্ষা করছিল, তখনই পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের ওপর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে শুরু করে। এই গ্রন্থটির ১০/১২ কপি বাঁধাই অবস্থায় কারো করো হাতে যায়। আমার জানামতে বি আই ডি এস গ্রন্থাগারে এর একটি কপি রয়েছে।

১৯৭৬-এ দেশে ফেরার কয়েক বছরের মধ্যে ড. আবু মাহমুদ নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেন। তাঁর মন মেজাজ দিন দিনই খিটখিটে হয়ে উঠছিল। তিনি ক্রমান্বয়ে লোক জনের সঙ্গে মেলামেশা করাটা কমিয়ে দিতে লাগলেন। নিজ বাসগৃহের দুয়ারে ভেতর থেকে তালা ঝুলালেন। অতীতের অনেক শুভানুধ্যায়ী ও গুনগ্রাহীরা তাঁর সঙ্গ বর্জন করেন চললেন। তাঁর অসহিষ্ণু আচরণ হয়তো অনেককে ক্ষুব্ধ করেছিল। এমনকি অর্থনীতি সমিতির সেমিনার ও বার্ষিক অধিবেশণ গুলোতে তাঁকে নিয়ে আসার জন্য কেউ গরজ দেখাত না। বাংলাদেশে অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত শুগপিটার, মার্ক্স ও কেইনসের শতবার্ষিকী সেমিনারে তাঁকে বেশ বিলম্বেই ডেকে নিয়ে আসা হয়। অবশ্য সেদিন তিনি বেশ রসোত্তীর্ণ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শ্রোতাদের ধরে রাখার তাঁর ছিল অপূর্ব ক্ষমতা। আমার জানামতে এর পর আর কোনো অনুষ্ঠান বা সেমিনারে তিনি ভাষণ দেন নি।

www.nagorikpathagar.org

জীবনের শেষ দিকে লেখা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলো সম্পাদনার কাজে ড. আবু মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আবুল বারাকতের কাছ থেকে অকৃত্রিম সহযোগিতা পান। ড. আবু মাহমুদ নিজেও বারবার আমার কাছে আবুল বারাকতের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ড. আবু মাহমুদ সত্যিই বিতর্কিত হয়ে পড়ছিলেন। বিশেষ করে জাতীয় উন্নয়নে সেনা বাহিনীর ভূমিকা সংক্রান্ত তাঁর থিসিসের কারণে। শাসকগোষ্ঠী তাঁর এই থিসিসের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল, কিন্তু অবাক হলেও সত্য যে, তাঁর প্রফেসর ইমিরিটাস হবার ফাইলটি নানা আইনগত আনুষ্ঠানিকতার কারণে চাপা পড়েছিল।

আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশের স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা ড. আবু মাহমুদকে ক্রমান্বয়ে অস্বাভাবিক আচরণের পথে ঠেলে দেয়। সমাজও তাঁর স্বাভাবিক অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর চরিত্রে দুর্বলতার ভাগও কম ছিল না। পৃথিবীর অনেক মুনি-ঋষি ও দার্শনিকের জীবনে এসব দুর্বলতা কম খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবুও আমরা তাঁদের স্মরণ করি তাঁদের মহৎ অবদানের জন্য, তাঁরা যা করতে পারেন নি যা কিছু ভুল করেছিলেন সেই ব্যর্থতার জন্য আমরা তাঁদের দায়ী করি না। আজকের প্রয়োজন, ড. আবু মাহমুদের সমস্ত লেখা সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা। অবশ্য একাজটি করার আগে তাঁর সমুদয় লেখা একটি দক্ষ সম্পাদক মণ্ডলীর হাতে সম্পাদনা করিয়ে নেওয়া উচিত হবে, কারণ তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি ও সঙ্গতিহীনতা লক্ষ করা যায়। তদুপরি গ্রন্থনির্দেশ ও সূত্র উল্লেখের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। একাজটি সাফল্যের সঙ্গে করা গেলে আমাদের নতুন প্রজন্ম তাঁর অবদান সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে।

জার্মানির জনগণের মুক্তি সংগ্রাম প্রসঙ্গে মার্ক্স লিখেছিলেন,

"We must make the actual oppression even more oppressive by making people conscious of it, and the insult even more insulting by publicizing it....... we must force these petrified relationships by playing its own tune to them. To give people courage we must teach them to be alarmed by themselves."

ড. আবু মাহমুদ আজীবন আমাদের একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমাদের ওপর তথা বাংলাদেশের জনগণের ওপর কী ভয়ানক নিপীড়ন চলছে। নিপীড়নের এই বোধই তো নিপীড়নকে আরো অসহনীয় করে তোলে। অবমাননার এই অনুভূতিই তো অপমানকে বিদ্রোহে রূপান্তরিত করে। ড. আবু মাহমুদ অমর হবেন তাঁর এই নীতিনিষ্ঠ ভূমিকার জন্যই।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে : জাতি-রাষ্ট্র গঠনের সংকট

জাতির জন্য এখন এক সর্বগ্রাসী সংকটের সময়। এই সর্বগ্রাসী সংকটের কথা আমরা গত কয়েক দশক ধরে বলে আসছি। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই সংকট যেন ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হয়ে উঠছে। এই সংকটের চেহারা এ দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে স্পষ্ট।

সংকটের গভীরতা ও ব্যাপকতা নিয়েও আজ আর তেমন দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হল এই সংকটের উৎস কোথায়? আমরা যদি এর উৎস নির্ণয় করতে না পারি তা হলে এর সমাধানও করতে পারব না। অনেকে মনে করেন এটা ক্রান্তিকালীন সমস্যা। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে এ ধরনের ক্রান্তিকালীন সমস্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। হ্যাঁ, এক অর্থে একে ক্রান্তিকালের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, এই সংকটের মূলে রয়েছে জাতি-রাষ্ট্র গঠনের সমস্যা।

বাংলাদেশে বসবাসকারী জনগণের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস প্রাচীন। কিন্তু জাতি রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের ইতিহাস মাত্র দু দশকের। ইতিহাস যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আলোড়িত হয়, নিজস্ব গতিময়তার সূত্রে একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়, তার প্রেক্ষাপটে দু দশক সময় সামান্য মাত্র। আমরা জানি, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর পৃথিবীর বেশ কয়েকটি জাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্ব সভায় মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে। সে সব জাতির তুলনায় আমাদের ব্যর্থতা অপরিসীম।

দেশে দেশে সময় ও কালের বিবর্তনে কোনো একটি সামাজিক শ্রেণী তার নিজস্ব সৃজনশীলতার গুণে আর্থ-সামাজিক বিকাশে নেতৃত্ব দেয়। নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণকারী সৃজনশীল এই সামাজিক শ্রেণী গোটা সমাজের একটি ক্ষুদ্রাংশও হতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও এই শ্রেণীর থাকে জনগণের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানর ক্ষমতা, সমাজের উৎপাদিকা শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক উদ্বৃত্ত আহরণ করে তাকে বর্ধিত উৎপাদনের কাজে ব্যবহার এবং সর্বোপরি উৎপাদনের কৃৎকৌশলে উৎকর্ষ সাধনের জন্য জনগণের মধ্যকার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করার ক্ষমতা। প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার কথাই ধরা যাক। দাস-ভিত্তিক এক নিষ্ঠুর সমাজিক বৈষম্যই ছিল এই সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য। সমাজের এক ক্ষুদ্রাংশ 'ফারাওরা' ছিল, এই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণকারী অধিপতি শ্রেণী। জটিল ও বিপুল সেচব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনের বিকাশ, কৃষি ব্যবস্থা ও জমির হিসাব-নিকাশের সহায়তায় গণিত শাস্ত্রের অন্যতম শাখা হিসেবে জ্যামিতির বিকাশ, সংখ্যার ব্যবহার এবং ভাষাকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য লিপির প্রবর্তন এই সভ্যতার মৌলিক

www.nagorikpathagar.org

অবদান। আমরা প্রায়শই বলে থাকি, পিরামিড, মমি ও স্ফিংকসই হল মিসরীয় সভ্যতার অবদান। মানুষের সৃজন ক্ষমতা ও শৈল্পিক গুণাবলির এক চমৎকার নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও এসবই এ সভ্যতার অবক্ষয় নিয়ে এসেছিল। সামাজিক উদ্বৃত্তের এক বিপুল অংশ মন্দির ও সমাধিক্ষেত্রের মতো অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যয়িত হওয়ার ফলে, উৎপাদনের নবতর চক্রের জন্মদানে ব্যর্থতার ফলে যে সংকট ও বিরোধের উৎপত্তি হয়- তা সামাল দেওয়ার ক্ষমতা ফারাওদের রইল না। একদা বিকাশমান সভ্যতা পর্যবসিত হল ক্ষয়িষ্ণুতায়। সুতরাং জনগণের মধ্যকার সৃজনীশক্তির যথাযথ ব্যবহার ও একে বিকশিত করার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে জনগণের এই ক্ষমতাকে ব্যবহার করার যোগ্যতা সম্পন্ন শ্রেণীর অবস্থানই একটি জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির জন্য এক প্রয়োজনীয় শর্ত।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সমাজে এমন কোনো স্পষ্ট পরিচয় ব্যক্তকারী শ্রেণী ছিল না, যে শ্রেণী জাতিকে একটি নির্দিষ্ট উন্নয়ন ও বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারত। কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশ সংগ্রামের মূলে রয়েছে পাকিস্তানি ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বাঙালি উঠতি ধনিক শ্রেণীর ক্ষোভ। এবং বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃত্বে এরাই ছিল। এ ধারণাটি যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তা হলে প্রশ্ন থেকে যায়, কী করে এই শ্রেণীটি সমাজতন্ত্রের বাগাড়ম্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করল? কিংবা কী করে 'সমাজতন্ত্র' এই নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হল? অন্যদিকে, স্পষ্ট পরিচয় ব্যক্তকারী শ্রমিক শ্রেণীর অস্তিত্ব যদি থাকত, তা হলে তস্কর ধনিক শ্রেণীর স্ফীতি প্রতিহত করা গেল না কেন? বস্তুত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মলগ্নে ভ্রূণাকারে আমাদের সমাজে এদুটি শ্রেণীই ছিল, কিন্তু একটি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্রকে করায়ত্ব করা ও গোটা সামজের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা এদের কারুরই ছিল না। মূলত, বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী- আমলা, উকিল- মোক্তার, সৈনিক, কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষ ছিল এর অন্তর্গত। পেশাজীবীরা উৎপাদন ব্যবস্থায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু কখনো নিয়ামক হতে পারে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় মধ্যবিত্ত পেশাজীবীরা ছিল উর্ধ্বতনের প্রতি বিরক্ত ও অধস্তনের ভয়ে ভীত। অবাঙালি উর্ধ্বতনের কারণে সামাজিক উদ্বৃত্তে এরা আকাঙ্ক্ষিত হিস্যা নিতে পারছিল না, অপরদিকে মেহনতি মানুষের ভয়ে এরা ছিল সন্ত্রস্ত। সুতরাং এমন একটি নতুন রাষ্ট্র তারা চাইল যে রাষ্ট্রের অভ্যুদয় বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী-কর্মজীবী মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রয়াসের ফসল নয়, কারণ তাতে রাষ্ট্রটি হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, বিকল্প হিসেবে ভিনদেশী সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরতাই তাদের নিকট কাম্য বোধ হয়েছে। আর এরই ফলে নবজন্মলব্ধ রাষ্ট্রটি হল পরাশ্রিত, পরনির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই মধ্যবিত্তরা জানত

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রযন্ত্রের আগ্রাসী হস্তকে যত বেশি সম্ভব সম্প্রসারিত করা যাবে, ততই তারা সমাজিক উদ্বৃত্তের ওপর নিজেদের হিস্যা বাড়াতে সক্ষম হবে। এ কারণে আমলাতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রীয় খাত প্রধান 'সমাজতন্ত্র' এরা প্রতিষ্ঠা করল। এই সমাজতন্ত্র ব্যক্তি পুঁজিবাদের দক্ষতা বিবর্জিত ও তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্রের অন্তর্গত মেহনতি মানুষের লালন ও পরিপুষ্টি বর্জিত। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট অনিবার্য হয়ে উঠল। দেখা গেল এই ব্যবস্থা নিজেকে উৎপাদনের চক্রে পুনরুজ্জীবিত করার পরিবর্তে বর্তমানের ভোগের মোহে আবিষ্ট আত্মধ্বংসী এক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। ভিন্ন রাষ্ট্রের কৃপাপুষ্ট এই মধ্যবিত্তরা জাতীয় রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রাথমিক শর্ত জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিও ঘৃণা ও অবহেলা দেখাতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এরা প্রায়শই বলে থাকে বাংলাদেশের মতো রাষ্ট্রের জন্য জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। তাদের যুক্তি, সমস্ত শক্তি সামর্থ্য জড়ো করেও বৈদেশিক আক্রমণ, বিশেষ করে, ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী অক্ষম। তাদের অপর যুক্তি হল, এ ধরনের আক্রমণের সম্ভাবনাও নেই। কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে এ দেশটি একটি অপ্রয়োজনীয় বোঝা না হয়ে পারে না। তাদের এসব যুক্তির অসারতা তখনি স্পষ্ট হয়ে উঠে যখন আমরা দেখব যে ভারতের বিপুল বাহিনী থাকা সত্ত্বেও ভারত তার সমুদয় সামরিক শক্তি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে অক্ষম। কারণ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার (দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও আসাম) খাতিরে তাকে সেনাবাহিনীর একটি অংশ মোতায়েন রাখতে হয়। সারাদেশে শান্তি বজায় থাকলেও সম্ভাব্য জরুরি অবস্থার জন্য তাকে সেনাবাহিনীর একটি অংশ মজুত রাখতে হয়। এ ছাড়া একাধিক আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানও তাকে করতে হয়। সুতরাং বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালাতে নিজস্ব সামরিক শক্তির যথেচ্ছ সমাবেশ ঘটানোর স্বাধীনতা ভারতের নেই। উপরন্তু, এ ধরনের সামরিক হঠকারিতার কূটনৈতিক সীমবদ্ধতাও কম নয়। কিন্তু তাই বলে ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সামরিক উচ্চাভিলাষকে ছোট করে দেখার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ভারতের শাসক-শ্রেণী অখণ্ড ভারতে একাধিক রাষ্ট্রের উৎপত্তিকে মাতার অঙ্গচ্ছেদের শামিল মনে করে। ভারতীয় বৈদেশিক নীতির একটি প্রধান লক্ষ্য হল ইতিহাসের গতিকে অখণ্ড ভারতমুখী করা। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন এবং অখণ্ড ভারতের লক্ষ্যে কমনওয়েলথ অব সাউথ এশিয়ান স্টেটস সংক্রান্ত আলোচনা ও কথাবার্তা ভারতীয় শাসক শ্রেণীর অনুপ্রাণিত কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয় লগ্নে কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় বাংলাদেশের ভারতের অঙ্গীভূত হওয়ার পক্ষে ওকালতি করে সম্পাদকীয় রচনা ও এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রহস্যজনক নীরবতা কোথাও যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্রের ইঙ্গিত দেয়।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ পরমুখাপেক্ষী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিরক্ষা বাহিনী বিলোপ সাধনের খোঁড়া যুক্তি হাজির করতে উৎসাহিত করেছে সন্দেহ নেই। অপরদিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্রকে কেন্দ্র করে সামরিক ও বেসামরিক শাসনের মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা পেশাজীবীদের সামজিক উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রণ ও আত্মসাতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৈ আর কিছু নয়। এই পেশাজীবীদের ওপর উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ বহল না হওয়ায় এদের আচরণে পেশাদারিত্ব লক্ষ করা যায় না। আমাদের সমাজে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, কর্মচারী কিংবা কর্মকর্তা কেউ কি তার পেশার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন? প্রকৃত পক্ষে একটি দেশে প্রকৃত দেশপ্রেমিক হতে পারে সত্যিকারের পুজিঁপতি শ্রেণী অথবা মেহনতি শ্রেণী। সত্যিকারের পুঁজিপতিরা দেশকে ভালবাসবে, দেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইবে তার বিনিয়োগের ফসল রক্ষা করতে অন্যদিকে মেহনতি জনগণ তা করবে তার মেহনত ও ঘামের ফসলকে রক্ষা করার জন্য। অন্য কোনো শ্রেণীর কাছ থেকে এই ভূমিকা আশা করা যায় না। জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সমস্যা হল এই রাষ্ট্রে এই দুই শ্রেণীর কারুরই কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ হয় নি। যেহেতু এই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এখনো অব্যাহত, সেই হেতু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে অস্থিতিশীলতা কেবলই বাড়ছে। এই অস্থিতিশীলতার ছিদ্র পথে বৈদেশিক আধিপত্যের বিপদও বাড়ছে। একটি স্থিতিশীল জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত পুঁজিপতিরাই অধিপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ রকম একটি শ্রেণীর আধিপত্য বহাল হলে অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীগুলো, বিশেষ করে, পেশাজীবী মধ্যবিত্তরা তার আধিপত্যের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এখানে শ্রেণীগত আধিপত্য বলতে শুধু সরকার গঠনে সাফল্য বোঝায় না, এ আধিপত্য সর্বব্যাপক। এ আধিপত্য রাষ্ট্রযন্ত্রের সামরিক ও বেসামরিক কাঠামোর ওপর আধিপত্য। জনগণের চিন্তা ও চেতনার জগতের ওপর আধিপত্য। ঐতিহাসিক বিকাশের এক বিশেষ মুহূর্তে ও বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের উদ্ভব হওয়ায় বাংলাদেশে জাতীয় রাষ্ট্রের উল্লিখিত শর্ত পূরণ আজো সম্ভব হয় নি। এ কারণে, সমাজ জীবনে উত্তরোত্তর বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা বাড়ছে, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাও হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। এই গোলমেলে পরিস্থিতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রাষ্ট্রের সামরিক ও আমলাতন্ত্রে যাদের আধিপত্য, হয়তো সরকারে তাদের আধিপত্য নেই, আবার সরকারে যাদের আধিপত্য, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রচার মাধ্যম তথা মানুষের চিন্তার জগতের ওপর তাদের আধিপত্য নেই। বিপরীতমুখী শক্তির টানাপোড়নে সমাজ জীবনে নেমে এসেছে প্রচণ্ড অস্থিরতা। এই টানাপোড়নের একটি অন্যতম বহিঃপ্রকাশ হল স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি কথাটির অপব্যাখ্যা বা আংশিক ব্যাখ্যায়। এদেশে একদল কেবল মাত্র পাকিস্তান ও তার সহচরদের মধ্যে স্বাধীনতার শত্রু খোঁজে অথচ গাঙ্গেয় বদ্বীপের কৃষি নির্ভর এই দেশটির টিকে থাকার প্রধানতম শর্ত

www.nagorikpathagar.org

পানির প্রবাহের নিশ্চয়তা, ভিন্ন রাষ্ট্রের উসকানিতে পার্বত্য জেলাগুলোতে বিচ্ছিন্নতা বাদী প্রয়াস, সীমান্ত চুক্তি কার্যকর করতে প্রতিবেশীর অনীহা কিংবা এ দেশেরই বিপুল অংশ নিয়ে স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের প্ররোচনা সম্পর্কে এরা নীরব। অপরদিকে, অন্যদল ভারত বিরোধিতাকে পুঁজি করে এই রাষ্ট্রটিকে সর্বতোভাবে পাকিস্তানি আদলে গড়তে চাইছে। এই দুই প্রবণতাই জাতীয় রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের শক্তি অর্জনের পথে অন্তরায়।

একটি জাতীয় রাষ্ট্রের নিজস্ব শক্তির উৎস হল উত্তরোত্তর সমাজিক উদ্বৃত্ত ও উৎপাদনমুখী কাজে তার ব্যবহার। বাংলাদেশের কৃষক সমাজ ভিন্ন অন্য কোনো সামাজিক শ্রেণীই এই দায়িত্ব তো পালন করছেনই না, উপরন্তু সমাজের কাছ থেকে তারা যা নিচ্ছেন তার খুব সামান্য অংশই তারা সমাজকে ফিরিয়ে দেন। বাংলাদেশের কৃষকদের টিকে থাকার প্রয়াস অদম্য। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে অনাহার ও অর্ধাহারের কষ্টকে অম্লান বদনে মেনে নিয়ে, বছরের পর বছর উৎপাদন সচল রাখা তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। বস্তুতঃ জাতির অন্যান্য অংশের জন্য তারা ভর্তুকি যোগায়। তাদের ভর্তুকির বিনিময়ে আদালতের হাকিম-ম্যাজিস্ট্রেট, থানার দারোগা- পুলিশ, বিদ্যালয়- বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, হাসপাতাল ক্লিনিকের ডাক্তার- কম্পাউন্ডার, সরকারের আমলা কর্মকর্তা, সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিক এবং এমনকি কারখানার শ্রমিক নিরাপত্তা স্বস্তি ও বিলাসিতার জীবন কাটাচ্ছে। ফলে, জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের কিছুই অবশিষ্ট থাকছে না। বাড়ছে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা। এই পরিস্থিতির অবসানের জন্য চাই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে উৎপাদন অন্বিষ্ট শ্রেণীর আধিপত্য। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সমাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই উৎপাদন অন্বিষ্ট শ্রেণীর সর্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের ক্রান্তিকাল অব্যাহত থাকবে ও স্থিতিশীলতা অর্জনও সম্ভব হবে না।

www.nagorikpathagar.org

বংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট ও সম্ভাবনা

গণতন্ত্রে আছে অনেক মত ও পথ। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা নিয়েও আছে অনেক মত ও মতদ্বৈধতা। শুরুতেই স্পষ্ট করে বলে রাখা দরকার, বক্ষ্যমাণ আলোচনায় আমরা গণতন্ত্র বলতে বুঝব সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত সরকার ব্যবস্থা, প্রশাসনের হস্তক্ষেপমুক্ত স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, মত ও চিন্তার উদারনৈতিক স্বাধীনতা, নির্বাচনে পরাজিত হলে শাসকদলের বিজয়ী দলের হাতে দ্বিধাহীন ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর, সংখ্যালঘিষ্ঠের সম্মতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন এবং সর্বোপরি সামরিক বাহিনীর ওপর বেসামরিক কর্তৃত্বের নিরঙ্কুশ আধিপত্য। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রে উপর্যুক্ত অর্থে গণতন্ত্র কখনোই সুষ্ঠু ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরাচার একাধিকবার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পর্যদুস্ত করেছে এবং গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে সমাজে ব্যক্তির মূল্য ও গুরুত্ব রাষ্ট্রের হাতে চরমভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কী অদ্ভুত বৈপরীত্য এই বাংলাদেশেই গণতন্ত্রের জন্য শত শত তাজা প্রাণ আত্মাহুতি দিয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য আমাদের জাতীয় জীবনের এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো এবং এদেশে গণতন্ত্রের সাফল্যের সম্ভাবনা নির্ণয় করা।

১৯৭১-এর মার্চে পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অভিব্যক্তি ও আকাঙ্ক্ষাকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক যুক্তিহীন ও নিষ্ঠুর দমনের মধ্যদিয়ে এ অঞ্চলের জনগণের সংগ্রাম নতুন মোড় নেয়। শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম রূপান্তরিত হয় সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধে। পাকিস্তানোত্তর কালে ভাষা, গণতন্ত্র ও সামজিক ন্যায় বিচারের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এদেশের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে নতুন নতুন সামাজিক শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বিচিত্ররূপী সামাজিক শক্তিগুলো ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসে। এইসব শক্তিসমূহকে সমন্বিত, ঐক্যবদ্ধ ও আত্মস্থ করে স্বাধীনতা যুদ্ধকে আত্মনির্ভরশীল পথে পরিচালনা করার মতো ইচ্ছা কিংবা শক্তি আমাদের জাতীয় নেতৃত্বের ছিল না। মন মানসিকতায় এই নেতৃত্ব ছিল উর্ধ্বতনের প্রতি বিরক্ত ও অধস্তনের ভয়ে ভীত। এরা যেমন পাকিস্তানি কর্তৃত্বকে পারে নি পুরোপুরি মেনে নিতে, অপরদিকে পারে নি নব উত্থিত সামাজিক শক্তির জন্য রাজনীতির নতুন রঙ্গমঞ্চে স্থান করে দিতে। এই মানসিকতার ফলশ্রুতি হল দ্রুততম সময়ে ভিন্ন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সমর্থনে মুক্তিযুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তি টানা, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিকে প্রশ্রয় দান ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে নতুন শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল

www.nagorikpathagar.org

তাকে নবগঠিত রাষ্ট্রের পরিমণ্ডলের প্রান্তে নিক্ষেপ করে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে গণ্য করা। '৭১-এর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভিন্নধর্মী একটি শক্তির উদ্ভব ঘটে।এই শক্তিটি নবগঠিত রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর রূপলাভ করে। '৭১-এর যুদ্ধের আগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই অংশটি '৭১-এর মার্চে পূর্ব বাংলার জনগণের আকাঙ্ক্ষার অস্বীকৃতি ও বাঙালি জাতির প্রতি পাকিস্তানিদের চরম অবমাননাকর আচরণে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক দিনগুলোতে এরাই প্রথম প্রতিরোধের ব্যূহ রচনা করে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে এরা হয় উপেক্ষিত ও সন্দেহভাজন। এক কথায় মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে যে সব নতুন সামাজিক শক্তির উন্মেষ ঘটেছিল তারা নবগঠিত রাষ্ট্রের কর্মপ্রবাহ থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে এক চরম বিচ্ছিন্নতা বোধে জর্জরিত হচ্ছিল। অথচ নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এদেরকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে আঙ্গিকভাবে সম্পৃক্ত করার মতো সমাজ প্রকৌশলবোধের পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক বরং এদেরকে রাষ্ট্রের সত্যিকার বা সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করতে লাগলেন। গোড়া থেকেই এই কল্পিত প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার জন্য দাঁড় করান হল এক বিকল্প শক্তি যার পরিচয় রক্ষীবাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে উত্থিত সবচাইতে অগ্রসর সামাজিক শক্তিগুলোকে দমন ও প্রতিহত করার দায়িত্ব দেওয়া হল এই বাহিনীর উপর। জাতি কিংবা রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তি বা দলের নিরাপত্তা বিধানই ছিল এই বাহিনীর দায়িত্ব। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে উত্থিত সামাজিক শক্তিগুলোকে এইভাবে চরম বিচ্ছিন্নতাবোধে নিপতিত করা হয়েছিল। এভাবে সৃষ্টি হয়েছিল শাসকদলের শাসনের সংকট। সংকট মুক্তির উপায় হিসেবে প্রবর্তিত একদলীয় শাসন এ সংকটকে আরো তীব্র করে তুলল। এরই মধ্যদিয়ে নবউত্থিত সামাজিক শক্তিগুলোসহ সমগ্র জাতি ভাবতে শুরু করল নতুন রাষ্ট্রে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই। সকল কালে সকল যুগেই কুশলী শাসকরা শাসন কার্যে নানা ছলাকলার মধ্যদিয়ে সমগ্র জাতি বা তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে একথা ভাবতে অভ্যস্ত করায় যে, রাষ্ট্রের সঙ্গে সে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কিত। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে ঘটনা প্রবাহ এর সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী রূপ গ্রহণ করে। সংবাদ পত্রসহ সকল মাধ্যমে ভিন্নমত প্রকাশের পথ রুদ্ধ থাকায় নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত জাল বিস্তার করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশোত্তর কালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বেসামরিক কর্তৃত্ব ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়। শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা, যথাযোগ্য সমাজ প্রকৌশলীর ভূমিকা গ্রহণে ব্যর্থতা এবং নতুন যুগে নবউত্থিত সামাজিক শক্তিকে আস্থায় নিতে না পারার ফলেই বাংলাদেশের ইতিহাসের এই পর্যায়ে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক করা গেল না।

পুঁজিবাদ ও স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন পশ্চিমা বিশ্বে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মূল সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সমকালীন তৃতীয় বিশ্বে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমষ্টিগত পরিবর্তন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ধারায় ঘটে চলেছে। এসব দেশে রাষ্ট্রকেই পুঁজিবাদ গঠনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৌলিক ভূমিকা পালন করতে

www.nagorikpathagar.org

হয়। উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে গঠিত এসব দেশে রাষ্ট্রকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে ভূমিকা পালনের জন্য নব জন্মলব্ধ পুঁজিবাদকে সহায়তা করতে হয়। পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে উদীয়মান উদ্যোক্তা শ্রেণীর সহায়তা লাভ করেছিল। কিন্তু সমকালীন তৃতীয় বিশ্বে পুঁজিবাদের গঠন ও এর পরিপোষণ একটি রাজনৈতিক দায়িত্ব। রাষ্ট্র যখন নিজেই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে তখন যুগপৎভাবে রাষ্ট্রকে সমাজের চাহিদার প্রতি সাড়া প্রদান করানো অন্তর্নিহিত ভাবেই কঠিন হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্যে সমাজের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শিথিল করা সম্ভব হয়েছিল গতিশীল সামাজিক শক্তির অবস্থানের ফলে। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের ভূমিকায় পরিবৃত হয়, সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে খাটো করা যাবে কী করে? এই ঐতিহাসিক পারম্পর্যের কারণেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে গণতন্ত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বেচ্ছাকৃত সৃষ্টি না হয়ে রাজনৈতিক এলিটদের দান দক্ষিণার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সমস্যাটি আরো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপুল জনসংখ্যার চাপে ন্যুব্জ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ উদ্বৃত্তের পরিমাণ খুবই সামান্য। চরম আত্মসংযম ও মিতব্যয়িতার নীতি বোধকে কাজে লাগিয়ে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তে সমাবেশ সাধন করতে সক্ষম- এমন কোনো উদ্যোক্তা শ্রেণীও আমরা এখানে লক্ষ করছি না। এখানে রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য ও সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হয়। বস্তুত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন যে এলিটগোষ্ঠীর হস্তগত হয়, তখনই সেই এলিটগোষ্ঠীর হাতে রাষ্ট্র আদিম সঞ্চয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং রাষ্ট্র নায়ক কামধেনুটিকে করায়ত্ব করার জন্য প্রধান প্রধান এলিট গোষ্ঠীর মধ্যে চলতে তাকে তীব্র প্রতিযোগিতা। এই তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে রাজনীতির অঙ্গনে মারমুখী বাক্য বিনিময় হতে থাকে। 'সংসদ অচল করে দেওয়া' কিংবা 'সরকার পতনের জন্য সর্বাত্তক আন্দোলনের হুমকি উচ্চারিত হতে থাকে। এরূপ অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার জন্য অস্থিরতা প্রকাশে প্রতিযোগী এলিটদের তেমন কোনো কল্যাণ না হলেও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সমূহ ক্ষতি হয়। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যেসব দেশে গণতন্ত্র আজ সুপ্রতিষ্ঠিত সেসব দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে আপসের রাজনৈতিক ঐতিহ্য দীর্ঘদিন ধরে বলবৎ ছিল। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক আপসের ঐতিহ্য গড়ে না উঠার বাস্তবভিত্তি এখনো বিদ্যমান। ঐতিহাসিকভাবে এদেশে এ ধরনের রাজনীতি চর্চা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার অবকাশ ছিল না বললেই চলে। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, একদলীয় স্বৈরশাসনের পরিবর্তন এবং সাম্প্রতিক কালে সামরিক স্বৈরাচারের উচ্ছেদের সংগ্রামে আপসমূলক ভূমিকার কোনো অবকাশই ছিল না। তদুপরি দীর্ঘ দিনের অগণতান্ত্রিক শাসনের ফলে কতিপয় অমিমাংসিত রাজনৈতিক সমস্যা আপস ও সমঝোতার রাজনীতি চর্চাকে অসম্ভব

www.nagorikpathagar.org

করে তুলেছে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় আওতার বাইরে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুদয় না ঘটা পর্যন্ত মূল অর্থনৈতিক শক্তির আধার রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অচলাবস্থা অব্যাহত থাকাটাই স্বাভাবিক। ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও নিরাপদ হতে পারবে না।

গণতান্ত্রিক ধরনের সরকার সম্পর্কে উদারপন্থী, রক্ষণশীল বা মার্ক্সবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি যাই হোক না কেন তারা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে পুঁজিবাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের একটা যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে। চার্লস ই লিন্ডব্লুম, স্যামুয়েল হান্টিংটন ও বারিংটন মূল (জুনিয়র) এর মত বিপরীত চিন্তার পণ্ডিতবর্গ এই সম্পর্কের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রশ্ন হল এই সম্পর্কের কথা কেন বলা হয়? ইউরোপীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বিজয়ী বুর্জোয়াদের অভ্যুদয়ের কথা আলোচিত হয়ে থাকে। এই মতবাদ অনুসারে উদীয়মান ধনিক শ্রেনী রাজকীয় রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজেদের প্রভাবাধীন করতে পেরেছিল। অভিজাত শ্রেণীর জন্মগত কারণে রাষ্ট্র শাসনের দাবিকে তারা চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয় এবং তার জায়গায় ধনবান সাধারণরাই দেশ শাসন করবে এই নীতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। ইউরোপে ধনিক শ্রেণীর পাশাপাশি নতুন সামাজিক শক্তি হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। শ্রমিক শ্রেণীর সংঘটিত চাপের মুখে এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হল যে ইউরোপীয় গণতন্ত্রে আইনানুগ সরকারের ভিত্তি হবে আইনের দৃষ্টিতে সমান নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত সরকার। এই ঐতিহাসিক পারস্পর্যের ভিত্তিতেই ব্যারিংটন মূর সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, যেখানে বুর্জোয়া নেই সেখানে গণতন্ত্রও থাকতে পারে না।

গণতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া থেকেও বোঝা যায়। পুঁজিবাদ হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভিত্তিক একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এ কারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি থাকে সীমিত। সমাজ জীবনে তাই লক্ষ করা যায় 'রাষ্ট্রীয়' ও 'ব্যক্তিগত' বলয়ের পার্থক্য। এই পার্থক্যের কারণেই গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা হল একটি সীমিত সরকার ব্যবস্থা। এই পরিস্থিতিতে মৌলিক আর্থ-সামজিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও আইনগত সাম্য বহাল থাকতে পারে। অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে রাজনৈতিক সাম্যকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা যায় বলে বৈষম্যমূলক সমাজে নির্বাচিত সরকারের ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি খুজে পাওয়া যায়। এতে করে এ ধরনের সমাজে যারা জন্মগতভাবে বৈষম্যের শিকার তারা সেই বৈষম্য থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে এই ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার র‍্যাডিক্যাল সমালোচকরা একে একটি মিথ্যামোহ বলে শনাক্ত করে থাকেন। বাংলাদেশের গণতন্ত্র সেই পরিমাণেই সফল হবে যে পরিমাণে এখানে পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতি গড়ে উঠবে। পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির মূল কথা হল বিনিয়োগ করার স্বাধীনতা, বিনিয়োগজাত মুনাফা অর্জন করার স্বাধীনতা, লব্ধ মুনাফা পুনঃবিনিয়োগ করার স্বাধীনতা, মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগের স্বাধীনতা, প্রয়োজনে শ্রমিককে বরখাস্ত করার স্বাধীনতা, শ্রমিকের

www.nagorikpathagar.org

নিয়োগকর্তা নির্বাচনে স্বাধীনতা, নিজ সম্পত্তি ও উপার্জন ভোগ ও উত্তরাধিকারের সূত্রে অর্জন করার স্বাধীনতা, তথ্য বিনিময় ও চলাফেরার স্বাধীনতা ও ব্যবসায়িক প্রয়োজনে চুক্তিতে প্রবেশ করার স্বাধীনতা। আমরা যদি বাংলাদেশের শ্রমের বাজারের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করি তা হলে দেখা যাবেএখানে শ্রমের বাজার যথার্থ অর্থে বিকশিত নয়, ফলে বাজার অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশও ব্যাহত।

ঐতিহাসিক ও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে গ্রাম বাংলায় শ্রমের বাজার যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারছে না। আমাদের দেশের গরিব কৃষকরা বিভিন্ন ধরনের বাধ্যতামূলক বিনিময় শর্তের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রাম বাংলার লাখ লাখ গরিব কৃষক নিজের ক্ষুদ্র এক খণ্ড জমিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে বাধ্য হয়। এর ফলে শ্রম ও জমির বাজার পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে বিকশিত হতে পারছে না। কিন্তু কৃষিজাত উৎপন্নের বাজার সে তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর। যেই মুহূর্তে আর কোনো বিকল্প থাকে না কেবলমাত্র সেই মুহূর্তে কৃষক ভূমির সঙ্গে বন্ধন চূড়ান্তভাবে ছিন্ন করতে বাধ্য হয়। এ যেন নিয়তির কাছে পরম আত্মসমর্পণ। ক্ষুদ্র জমি খণ্ড টুকে আঁকড়ে রাখতে গিয়ে কৃষককে নানা বেদনাদায়ক কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। কখনো উচ্চ হারে খাজনা দিয়ে, কখনো চড়া সুধে ঋণ করে, কখনো বংশ পরম্পরায় ঋণে আবর্তন ঘটিয়ে, আবার কখনো নিজের শ্রম বা ভবিষ্যৎ বংশধরদের শ্রম বন্ধক রেখে ক্ষুদ্র জোতটুকু ধরে রাখার মরণ পণ চেষ্টা চালাতে হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রদেয় খাজনার পরিমাণ সাধারণ জরিপে বর্ণিত খাজনার অনেক বেশি হয়ে থাকে। এই অবস্থায় জমির বাজার তাকে অবিকশিত কেননা নিঃস্ব ও চির অভাবগ্রস্থ কৃষক পরিবারগুলো চড়া খাজনায় জমি বর্গা কিংবা লাগিয়ত নিলেও জমি ক্রয় করার জন্য জমির বাজারে প্রবেশ করতে পারে না। নানাভাবে ঋণ-কর্জ করে, পরিবারে সদস্য/সদস্যাদের শহরের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে কাজ করতে পাঠিয়ে এবং গ্রামে নিজের শ্রম বন্ধক দিয়ে এই দরিদ্র কৃষকরা মোট অঙ্কের খাজনার টাকা যোগাড় করতে পারলেও জমি কেনার জন্য এককালীন একগুচ্ছ টাকা এরা সংগ্রহ করতে পারে না। ক্ষুদ্র জমি থেকে আয়ের পরিমাণ একজন দিনমজুরের আয়ের তুলনায় কম হওয়া সত্ত্বেও উপার্জনের অনিশ্চয়তা এইসব গরিব কৃষকদের জমির বন্ধনে বেঁধে রাখে। এ ধরনের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় জমির পুঞ্জীভবন সম্ভব হয় না। এবং পুঁজিবাদী সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারে না। এতে নিঃস্বায়ন চলতে থাকে এবং জমির বন্ধনমুক্ত প্রলেতারিয়েতের উদ্ভব বিলম্বিত হয়। অপরদিকে শ্রমের বাজারও থেকে যায় অবিকশিত। বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগহীন লাখ লাখ ক্ষুদে চাষীর এই দেশে চাষীরা সামান্য জমিতে নিবিড় শ্রম প্রয়োগ করে ভোগের প্রয়োজন মেটাতে প্রাণপাত প্রয়াস পায়। এতে জমির বাইরে ভাড়ায় শ্রম খাটানোর প্রবণতা কমে যায়। তদুপরি, শ্রমশক্তির একটা বিরাট অংশ পারিবারিক শ্রম হিসেবে ক্ষুদে খামারের কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে শ্রমের বাজার খর্ব হয়ে পড়ে। এসব কারণে শ্রমের মৌসুমি

www.nagorikpathagar.org

সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিতে পারে এবং বর্ধিষ্ণু চাষীরা জমি ও শ্রমের বাজারের মধ্যে কিংবা ঋণও শ্রমের বাজারের মধ্যে আন্তঃবাজার চুক্তিতে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ খোঁজে। শ্রমের অনিশ্চিত সরবরাহ এড়ানোর জন্য বছর চুক্তিতে মজুর নিয়োগ করা হয়ে থাকে। উপযুক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা গেল বাংলাদেশে জমির বাজার অবিকশিত থাকায় শ্রমের বাজারও অবিকশিত। আমরা শ্রমের বাজার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেয়েছি যে, সুষ্ঠু বাজার অর্থনীতি থেকে কতদূরে অবস্থান করছি। সত্যিকার বাজার অর্থনীতি অর্জন করা না গেলে গণতন্ত্রও অর্জন করা সম্ভব হবে না।

বাজার অর্থনীতির বিকাশের জন্য পুঁজির বিকাশ প্রয়োজন ও পুঁজির বিকাশের জন্য প্রয়োজন সঞ্চয়। কিন্তু বিপুল সংখ্যক নিঃস্ব 'প্লেবিয়ানদের' অর্থনীতিতে সঞ্চয় কী করে হবে? এই 'প্লেবিয়ান'রা তো তার ঘোর অনিশ্চিত বিপদশঙ্কুল ঝুঁকিময় জীবনে রোজকার মতো করে বাঁচে। এদের জন্য আগামী দিনের সুর্যোদয় দেখা প্রায় অনিশ্চিত। তাই প্রতিদিনকার উপার্জন প্রতিদিনকার ভোগের জন্য ব্যয় করাটাই এরা যুক্তির্যুক্ত মনে করে। যা হারিয়ে যেতে পারে বা বিনষ্ট হবে সেটাকে যত দুর সম্ভব সঙ্কুচিত করে আনাটাই এদের বিচারে সমীচীন। এরকম সমাজে পুঁজির বিকাশের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদের সমাবেশ ঘটান অত্যন্ত কঠিন কাজ। হানস মেডিকের ভাষায় এইসব 'প্লেবিয়ান'দের জীবন যাপনের সংস্কৃতিকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

A strategy of moncy saving or, indeed, one of maximising earning was, in such a situation, neither rational nor possible; what was rational was to minimise the continually threatened losses and that implied the immediate spending of money income which is usually uncertain and by no means regular. আমরা এভাবে লক্ষ্য করি নিঃস্ব কৃষকদের সনাতন moral economyর সঙ্গে বাজার অর্থনীতির এক সংঘাত বিদ্যমান।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালে আইন-শৃঙ্ক্ষলা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। হত্যা, খুন, গুম, ছিনতাই, রাহাজানি, মস্তানি, চাঁদাবাজি কল্পনাতীতভাবে বেড়ে গিয়েছে। আমাদের সামজে কখনোই আইনের নিয়ন্ত্রণ এতখানি ভেঙে পড়েছিল কি না সন্দেহ আছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিয়ম-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করতে যে পরিমাণ পুলিশী ব্যয় বৃদ্ধি প্রয়োজন হবে তা করার মতো সাধ্য আমাদের কতটা আছে তা ভাববার বিষয়। এসব অসামাজিক কর্মকাণ্ড আসলে ব্যাপক হারে rent seeking activities বেড়ে যাওয়ারই বহিঃপ্রকাশ। অর্থনীতি শাস্ত্রে ren't seeking এর ফলে সম্পদের অপচয় সম্পর্কে আলোচনা আছে। কিছু কিছু rent seeking activity অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক কালের এসব rent seeking activities এর ভিত্তি হচ্ছে পেশি ও রাজনৈতিক সম্পর্কের জের। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য বড় ধরনের আর্থিক

www.nagorikpathagar.org

বিনিয়োগ করতে হয় না। সমাজকে rent seeking থেকে profit seeking করতে না পারলে অর্থনৈতিক বিকাশ বা গণতন্ত্র কিছুই অর্জিত হবে না। খেলাপী ব্যাংক ঋণ গ্রহীতারাও Rent seeker-দের গোষ্ঠীভুক্ত। এক অর্থে এরাও গণতন্ত্রের শত্রু। Rent seeking এর সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল এতে এক হাত থেকে অন্য হাতে সম্পদের পুনবর্ন্টন হয়, কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এতক্ষণ আমরা বাংলাদেশের গণন্ত্রের বড় বড় কাঠামোগত অন্তরায়গুলোর কথা আলোচনা করেছি। তা' হলে কি বলতে হবে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের কোনো সম্ভাবনাই নেই? বিশেষ করে এই সব বিশাল অন্তরায় সমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের সমাজে এমন কোনোও প্রবণতা রয়েছে কি না যা বিভাজিত ও প্রতিদ্বন্দ্বী এলিটদেরকে সমঝোতার পথে নিয়ে যায়। ইতোমধ্যে সেই সমঝোতার প্রবণতা আমরা লক্ষ করেছি। বাংলাদেশের বড় দু'টি রাজনৈতেকি দল বাজার অর্থনীতিকে তাদের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। এটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের অগ্রগতি। নয় বছরের স্বৈরশাসনের পর সর্বমহলের কাছে গ্রহণ যোগ্য একটি নির্বাচন করতে পারা বিরোধের মধ্যে ঐক্যের নিদর্শন। নির্বাচনোত্তর কালে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে সংসদীয় ধরনের সরকার প্রত্যাবর্তনে বিতর্কের অবসানও এলিট সমঝোতার বহিঃপ্রকাশ। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর একাধিক উপনির্বাচন শান্তি পূর্ণভাবে সফল হওয়া এবং এ সম্পর্কে বিশেষ কোনো আপত্তি না উঠা সুস্থতারই লক্ষণ। গণতন্ত্রের পথে কাঠামোগত অন্তরায় গুলো দূর করা গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী এলিটরা গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের ক্ষমতার লড়াই সীমাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার ধারণা । অনেক সময় কিছু গভীরতা বিবর্জিত আলোচনায় উচ্ছৃঙ্খল ও অতিরিক্ত দাবি-দাওয়াকামী সাধারণ জনতাকে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য দায়ী করা হয় এবং এটাকেই স্বৈরশাসন কায়েমের অজুহাত হিসেবে দাঁড় করানো হয়। এসব কথা হয়তো আমাদের ফরাসি বিপ্লবের কথা মনে করিয়ে দেবে। কিন্তু সমকালীন বাংলাদেশে এর কোনো বাস্তবভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সাধারণ জনতা নয় বরং এলিটদেরকেই নিরস্ত করতে হবে। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে নীতিগতভাবে অভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গি গ্রহণ। এই প্রশ্নেও প্রতিদ্বন্দ্বী এলিটেরা কিছুটা কাছাকাছি আসতে পেরেছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক দলের সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে আধিপত্যবাদ বিরোধী লক্ষ্য ঘোষণা এর প্রমাণ। এরা এ ব্যাপারে কতটা আন্তরিক সে ব্যাপারে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এ প্রবন্ধে কাঠামোগত অন্তরায়সমূহ সবিস্তারে আলোচনার উদ্দেশ্য একটিই আর তা হল এলিটরা যদি গণতন্ত্রের প্রশ্নে আন্তরিক হন তা হলে ভাবতে হবে কত দুস্তর বন্ধুর পথ অতিক্রম করার আছে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকটে করণীয়

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে আমরা এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বোঝাই যেখানে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার বিদ্যমান, সকল প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষকে নিয়ে নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত, প্রত্যেক ভোটারের সমান ভোটাধিকার রয়েছে এবং প্রত্যেক ভোটদাতা রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপ থেকে স্বাধীনভাবে যে কোনো মত বা ব্যক্তির পক্ষে তাঁর ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। বাজার অর্থনীতি এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এখানে রাষ্ট্রক্ষমতা 'স্বাধীনতা, সাম্য, সম্পত্তির অধিকার ও দার্শনিক বেনথামের' নীতির ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিকাশধারা আদর্শগতভাবে বিরোধী মার্ক্সবাদী ও বুর্জোয়া উভয় দলের জন্যই এক দুর্বোধ্য ধাঁধার জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন ওঠে, পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশে কী করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি ক্ষুদ্র ধনিক গোষ্ঠী তাদের শাসন বজায় রাখতে পারছে?

ফ্যাসিবাদ ও স্তালিনবাদের নিষ্ঠুর শাসনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমা ধনতন্ত্রের কঠোর সমালোচকরাও গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারেন না। অন্যদিকে, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর প্রোথিত গণতন্ত্রকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হবে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সাংবিধানিক বিতর্ক থেকে বোঝা যায়, গণতন্ত্র ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা রয়েছে। স্টুয়ার্ট মিল-এর মতো উদারপন্থী দার্শনিকও এ কারণে গণতন্ত্রের উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতেন। তাঁর মতে, বিত্তহীনদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে আইন প্রণয়ন পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়তে পারে। তাই তিনি শিল্পোদ্যোক্তা, বণিক, ব্যাংকার ও অন্যান্য পেশাজীবী গোষ্ঠীর সদস্যদের বহু সংখ্যক ভোট প্রয়োগের অধিকার প্রদানের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন।

গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস খুব কম সময়ের নয়। জন প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা প্রজাতন্ত্র কিংবা সংসদীয় রাজতন্ত্রের অবয়বে গঠিত হতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে বেশিরভাগ সরকারই ছিল সাংবিধানিক রাজতান্ত্রিক ধাঁচের। এ ব্যবস্থায় সংসদের প্রতি মন্ত্রীসভার কোনো সুস্পষ্ট জবাবদিহিতা ছিল না। এ ধরনের ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না। কেননা, জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার কখনোই জনগণের সার্বভৌম অধিকার অস্বীকার করতে পারে না।

অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সতেরটি দেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে পরবর্তী দু'শ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। এসব দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার চালু করতে গিয়ে বেশ কিছু ধরনের বাধা-নিষেধ অপসারণ করতে হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য, শিক্ষাগতযোগ্যতা সম্পর্কিত বিধিনিষেধ। ইতালিতে ১৯১১ সন পর্যন্ত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলোতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও নিরক্ষরদের ভোটাধিকার ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে অস্ট্রিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। ডেনমার্ক ও যুক্তরাজ্যে 'ঠিকানাওয়ালা' মজুরি শ্রমিকদের ভোটাধিকার লাভের ইতিহাসও খুব বেশি দিনের নয়। সমান ভোটাধিকারের প্রশ্নটি বহু ভোট প্রয়োগের অধিকার পরিসমাপ্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যুক্তরাজ্যে বহুভোট প্রয়োগের অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৮ সনে উঠে যায়। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশসমূহের কোথাও সম্পদ, সাক্ষরতা ও নগরায়নের সঙ্গে তাল রেখে গণতন্ত্রের সুদৃঢ় ও শান্তিপূর্ণ বিকাশের প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় নি।

বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি অনুন্নত, দারিদ্র্যপীড়িত ও শিক্ষায় অনগ্রসর দেশে সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থার প্রচলনে আমরা পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অকল্পনীয়ভাবে এগিয়ে আছি। এখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতিসত্তা ও লিঙ্গ পরিচয়, সম্পত্তির মালিকানা ও পেশা নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান ভোটাধিকার আছে। তবে গণতন্ত্রের অবকাঠামোসমূহ যেমন, শিক্ষার বিস্তার, শিল্পায়ন, নগরায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন না হওয়ার ফলে ভোটাধিকার বাধা-বন্ধনহীনভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। গ্রাম বাংলায় ঋণ, জমি, বর্গাচুক্তি ও কর্মসংস্থানের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক দুর্বল হতে পারছে না। পুরোনো প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক ভেঙে পড়লেও তা আবার নতুন রূপ নিচ্ছে। এ ছাড়া, সামাজিকভাবে যারা দুর্বল তারা আত্মরক্ষার জন্য শক্তিমানদের আশ্রয় কামনা করেন। এসব কারণে সমাজে সমপর্যায়ের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। নৃতত্ত্ববিদ Erik Jansen লিখেছেন, "The many million small-holdings are the basis for the patron-client relationship through which a 'small surplus' peasant cultivates a many-stranded patron-client relationship with a handful of clients. Large or small, land-holdings would have increased the number of people siding the rich or influential on a permanent basis .... Extensive factions are mobilized when joint interest of a patron and his many clients are threatened. However, the corporate interests of a faction are specific, and as soon as the occasion or incident around which people have rallied disappears, the corporation withers away."

www.nagorikpathagar.org

এরকম সামাজিক ব্যবস্থায় সম্পদ সৃষ্টির চাইতে এর বন্টনই অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করে। সম্পদশালীরা তাদের client দের মধ্যে এসব বণ্টন করবেন এটাই মনে করা হয়। বিনিময়ে এসব ব্যক্তিদের সমীহ ও মান্য করে চলতে হবে। নেতৃবর্গের চরিত্র হবে কর্তৃত্বপরায়ণ। কর্তৃত্বের বলেই তাঁরা নিজেদের রক্ষা করবেন এবং সামান্য ব্যবধানে বিভক্ত অনুসারীদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বিরোধ ও দ্বন্দ্ব মিটিয়ে চলবেন। এ কারণে এখানে ব্যক্তি প্রধান নেতৃত্ব প্রাবল্য অর্জন করে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক রূপ অর্জনে ব্যর্থ হয়। সংগঠন যত বড় হবে দলাদলি হবে তত বেশি, নেতৃত্ব হবে সেই পরিমাণে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র হবে ততই দুর্বল ও অগণতান্ত্রিক। এক কথায় আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাহ্যিক রূপ অত্যন্ত উন্নত অথচ এর কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল।

রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে জাতি, ভাষা, ধর্ম ও বর্ণগত বৈচিত্র্য নেই বললেই চলে। তবুও এই দেশে ব্যক্তিত্বের বিরোধ প্রায়শই অন্য যে কোনো দেশের জাতিগত কিংবা বর্ণগত বিরোধের তুলনায় প্রকট ও প্রবল আকার ধারণ করে। অতীতে দেখা গেছে, বাইরের শক্তির আগ্রাসন কিংবা হস্তক্ষেপের মুখে এদেশে খুব সহজেই জাতীয় ঐক্য কিংবা সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে বিপদ কেটে যায় সে মুহূর্তে অনৈক্য ও বিভেদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

গণতান্ত্রিক সমাজে মতের অমিল বা বিরোধ অস্বাভাবিক বা অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু বিরোধিতার শেষ পর্যায়ে যদি সমঝোতা অর্জন করা না যায়, তা হলে তা সকল পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলাদেশী সমাজে পরস্পরকে হননের মানসিকতার মূলে রয়েছে সম্পদের প্রচণ্ড অপ্রতুলতা। এই অপ্রতুল সম্পদের জন্য সমাজে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এদেশে জমির সামান্য আইল নিয়ে খুনোখুনিও হয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের পরিমাণও খুবই অপ্রতুল। এ কারণে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়েছে। কৃচ্ছ্রতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত অর্জনের কঠিন বিকল্পটি আমাদের শাসন এলিটদের বিবেচনায় নিকট অতীতে স্থান পায় নি। কথায় বলে, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য হচ্ছে ধনী দেশের গরিবদের করের অর্থে ধনী ও দরিদ্র উভয় ধরনের দেশের ধনীদের স্বার্থ হাসিল। আমাদের মতো দেশে বৈদেশিক সম্পদের প্রবাহ মূলত রাষ্ট্রের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এ সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য চাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ। তাই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য ধৈর্যচ্যুতি ও অস্থিরতা প্রকাশই হল প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর স্বাভাবিক প্রবণতা। এ কারণে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নিরন্তর বজায় থাকলে তা বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণকারী শক্তিগুলোর জন্য সহায়ক হয়। একথা অনস্বীকার্য যে,

www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারলে বাংলাদেশের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিসঞ্চার সহজ হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ হয়তো দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে বহুজাতিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ও এসব রাষ্ট্রের টেকসই হওয়ার সম্ভাবনাকে জোরদার করবে। এ কারণে আধিপত্যকামী শক্তি আমাদের সমাজের অভ্যন্তরীণ ও কাঠামোগত দুর্বলতাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার আগুনে আরো দাহ্য পদার্থ সংযোগে তৎপর হয়ে থাকতে পারে।

ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে বৈরী জাতিগত দ্বন্দ্বের কারণে জাতীয় সমঝোতা অর্জন করা সম্ভব হয় নি। অথচ গণতন্ত্রই ছিল জাতীয় সমঝোতা অর্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিক ও স্বৈরশাসনের প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রীয় সংহতি টিকিয়ে রাখার ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু সে প্রয়াস বিপরীত কারকতার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ধ্বংস অনিবার্য করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণকারী শক্তিসমূহ গণতন্ত্রের স্থায়িত্বকে হ্রাস করে জনসংশ্লেষহীন শাসন ব্যবস্থাকে বারবার চেপে বসবার সুযোগ করে দিয়ে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ রচনার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত। ইদানীং বাংলাদেশে গণতন্ত্রের আকাশে যে কালো মেঘের আবির্ভাব হয়েছে তার সঙ্গে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিরোধীদের সামগ্রিক কৌশল সমান্তরাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই বৃহত্তর বিপদের কথা মনে রেখে সকল পক্ষের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদ্রেকই জনগণের একান্ত কামনা।

সরকার পরিচালনার প্রাথমিক সূত্র আলোচনা করতে গিয়ে David Hume মন্তব্য করেছেন,"Nothing more surprising than to see the easiness with which many are governed by the few; and to observe the implicit submission with which men resign their own sentiments and passions to those of their rulers. When we enquire by what means this wonder is brought about, we shall find that as force is always on the side of the governed, the governors have nothing to support them but opinion. It is therefore, on opinion only that government is founded; and this maxim extends to the most despotic and most military governments, as well as to the most free and most popular."

হিউমের মন্তব্য কিছু প্রশ্নের জন্ম দেয়। বিশেষ করে, 'শক্তি শাসিতের পক্ষে' কথাটি। কথায় বলে, তরবারির শক্তিই সর্বকালে সরকারি ক্ষমতার ভিত্তি নির্ণয় করেছে। অনেক সময় সুক্ষ্মভাবেও বল প্রয়োগ করা হয়। তৎসত্ত্বেও হিউমের মন্তব্যের একটি বাস্তব ভিত্তি আছে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরাও সম্মতি বাগিয়ে নিয়ে শাসন করতে চায়।

www.nagorikpathagar.org

জনগণের নিকট অধিকার ন্যস্ত করা মুক্ত সমাজেরই বৈশিষ্ট্য। হিটলারের মতো শাসকও উগ্র জার্মান জাত্যাভিমানকে পুঁজি করে তার ক্ষমতা কাঠামোর জন্য জার্মানদের সম্মতি যোগাড় করে নিয়েছিলেন। স্তালিনের রাশিয়া সম্পর্কে Alexander Gersehenkron বলেন, "Whatever the strength of the army and the ubiquitousess of the Soviet police which such a government may have at its disposal, it would be naive to believe that those instruments of physical oppression can suffice. Such a government can maintain itself in power only if it succeeds in making people believe that it performs an important social function which would not be discharged in its absence. Industrialization provided such a function for the Soviet Government...., (which) did what no government relying on the consent of the governed could have done....But, paradoxical as it may sound, these policies at the same time have scored some broad acquiesence on the part of the people. If all the forces of poplulation can be kept engaged in the process of industrialization and if this industrialization can be justified by the promise of happiness and abundance for future generations and much more importantly by the menane of military aggression from beyond the borders, the dictatorial government will find its power broadly unchallenged." এই বক্তব্য সপ্রমাণিত হয় যখন আমরা দেখি সোভিয়েত ব্যবস্থা আরো উন্নততর শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির স্তরে উত্তরণ ঘটাতে ব্যর্থ হয়ে ভেঙে পড়ে।

বর্তমান প্রবন্ধে এসব বিশ্লেষণ ও বক্তব্য সন্নিবেশিত করার উদ্দেশ্য ছিল একটি উপসংহারে আসা। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে নির্বাচিত হয়ে একটি সরকারের ক্ষমতায় যাওয়াই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টেকসই হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। এ জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিটি গণতান্ত্রিক পদক্ষেপের প্রতি জনগণের সক্রিয় সম্মতি নিশ্চিত করা। সরব সংখ্যালঘুর রাজনৈতিক কূটকৌশল, চাতুর্য ও রাজপথের সাজানো ক্যু'দেতার ফলে নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন অকার্যকর প্রমাণিত হতে পারে। এখানে স্মর্তব্য যে, ১৯১৭ সনের অক্টোবরে রাশিয়ায় বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলকে অনেক পশ্চিমা বিশ্লেষক 'বলশেভিক ক্যু' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইরানে সি আই এ তেহরানের কসাই ও দাগী অপরাধীদের ব্যবহার করে মোসাদ্দেক সরকারকে উৎখাত করেছিল। তাই, বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এই মুহূর্তের চাহিদা হল ব্যাপক জনগণকে সর্বাত্মকভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে সমবেত করে এ জাতীয় সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনাশ করা।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশে প্রশাসনের জবাবদিহিতা : কতিপয় প্রসঙ্গ

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রশাসন হবে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও দক্ষ। জনগণের সেবাই হবে এর মূলমন্ত্র। ১৯৯১ -এ গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর বাংলাদেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় গতিশীলতা, দক্ষতা ও গণমুখীনতা আনয়নের জন্য সময়োপযোগী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হবে–এমন প্রত্যাশা ছিল সকল নাগরিকের।

প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংস্থায় সংস্কার সাধনের কথা বলবার আগে জানা প্রয়োজন আমরা সংস্কার কেন চাই?

প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠে একথা মনে হতে পারে যে, আমাদের লোক প্রশাসন ব্যবস্থা বিশেষ করে বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিস প্রচণ্ড অন্তঃকলহে লিপ্ত। প্রকৃচি গোষ্ঠীর সঙ্গে সাধারণ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিরোধ দেশের উন্নয়ন ও প্রগতির অভিযাত্রাকে চরমভাবে ব্যাহত করছে। বাংলাদেশের মতো একটি সমমাত্রিক সমাজে খুব সহজে এই বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ নির্ণয় করা যাবে না।

স্বাধীনতার আগে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের বিরোধ লেগেই ছিল। জাতিগত বৈচিত্র্য ও বঞ্চনা এই বিরোধের মূলে কাজ করলেও তা কখনোই প্রকাশ্য আন্দোলনের রূপ নেয় নি। ১৯৭১ এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাঙালি সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাদের ধূমায়িত বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সে ক্ষোভের মধ্যে রাজনৈতিক উপাদানই ছিল মুখ্য।

বাংলাদেশে প্রশাসনের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বর্তমানে যে বিরোধ তাতে রাজনৈতিক উপাদানের চাইতে প্রশাসনিক এলিটদের গোত্রগত প্রাধান্যের বিষয়টি সম্ভবত অধিকতর প্রবল। অস্বীকার করবার উপায় নেই, কোনো সিভিল সমাজে যে কোনো বিরোধই শেষ বিচারে রাজনৈতিক এবং বিরোধে লিপ্ত সকল পক্ষই নিজ অবস্থানের যৌক্তিকতা প্রমাণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক উপাদানকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এখন কাঠামোগত সংস্কার চলছে। ব্যক্তিভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার সূত্রে অর্থনীতিকে পরিচালনা করাই এই সংস্কারের লক্ষ্য। অর্থমন্ত্রী তাঁর গত বাজেট বক্তৃতায় একটি আধুনিক, দক্ষ, সম্মুখমুখী ও সেবার্থীদের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বাজার অর্থনীতিতে মাথাভারী প্রশাসনের কোনো স্থান নেই। এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিই যখন অধিকাংশ সিদ্ধান্তের কেন্দ্র বিন্দু সেখানে বাজার প্রক্রিয়ার ব্যর্থতাজনিত কারণে যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না কিংবা ব্যক্তির

www.nagorikpathagar.org

সিদ্ধান্তজনিত কারণে যখন নানা ধরণের বিরোধের সূত্রপাত হয় তখন আইনের আলোকে এসব বিরোধের নিষ্পত্তি ও আইন প্রয়োগের জন্যই থাকবে প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।

বাজার অর্থনীতিতে সরকারের আকার যথাসম্ভব ক্ষুদ্র হবে। সেই সরকারই হবে সবচাইতে ভালো সরকার, যে সরকার শাসন কর্মটি করবেন সবচাইতে কম। অর্থমন্ত্রী বারবার মেদহীন, দক্ষ ও কার্যকর প্রশাসনের কথা বলে চলেছেন। এই প্রশাসনের কাজ হবে সরকারের নীতি ও অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নে যথাসম্ভব সাহায্য করা। কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা লক্ষ করি চাকুরিদাতা সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের অন্যতম প্রধান দেশ। এই সরকারের অধীনে ১০ লাখেরও অধিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত। ২৯টি বিসিএস ক্যাডারে বর্তমানে ৩৩,৩৩১ জন কর্মকর্তা কাজ করছেন। এর মাঝে শিক্ষা বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তার সংখ্যা ৯,২৪৭ জন, স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত রয়েছেন দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যক কর্মকর্তা। বিসিএস প্রশাসনে রয়েছেন ৪,৬৩৪ জন। সরকারের এই বিপুলায়তন নিয়ে কখনো কোনো মূল্যায়ন বা সমীক্ষা হয়েছে কি না আমার জানা নেই। তবে অর্থনৈতিক তত্ত্বের আলোকে এটুকু বলা যায়, প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের জন্য খরচের মাত্রা যত বেশি হবে, উন্নয়নের জন্য সম্পদের প্রাপ্যতাও ততই কম হবে। আজকাল আবার উন্নয়ন প্রশাসনের কথা বলা হয়। উন্নয়ন প্রশাসনেও প্রত্যক্ষ উন্নয়ন কর্মের তুলনায় প্রশাসনিক ব্যয়ের মাত্রা যে বেশি হচ্ছে সে ব্যাপারে অনেকেই অনুমান করছেন। বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা বারবার ব্যাহত হয়েছে। এ দেশের বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে সামরিক-আমলাতান্ত্রিক জোটের শাসনই প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সুতরাং জনপ্রতিনিধিদের সার্বিক কর্তৃত্বে কাজ করে যাওয়ার মানসিকতা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সন্তোষজনকভাবে গড়ে উঠতে পারে নি। এ রকম একটি রাষ্ট্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিযোগী কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়তে পারেন। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে, জনগণ, স্বজাতি ও স্বদেশের কথা ভাবতে গিয়ে পাকিস্তান আমলে অনেক প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিগৃহীত হয়েছেন–এমনকি ঔপনিবেশিক শাসকের বুলেটে আত্মাহুতি দিয়েছেন। প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত অধিকাংশ প্রশাসনিক কর্মকর্তা তাঁদের ছাত্রজীবনে সক্রিয় রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা করতেন। এ কারণে পেশাগত জীবনে প্রবেশ করার পরও তাঁদের অনেকের মধ্যে দেশভাবনা থেকে গেছে। এই দেশভাবনার কারণে তাঁদের অনেকে শুধুমাত্র সরকারি কর্মকর্তায় পরিণত হন নি, হয়েছেন একজন দেশদরদি মানুষও। এ সব ব্যক্তি প্রশাসকরা মানুষকে মানুষ হিসেবেই ভাবেন, কোনো অধস্তন শ্রেণীর সদস্য হিসেবে দেখেন না।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেকটি দেশভাবনার অন্তরালে রয়েছে একটি রাজনীতি। অন্যদিকে আমাদের মতো সমাজে দেশভাবনা অনেক বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দেশভাবনার অন্তরালের রাজনীতি দু ভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমত, নৈর্ব্যক্তিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠান জন্য এটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে, অন্যদিকে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট দুর্নীতি ও অদক্ষতার জন্ম দিতে পারে। সর্বোপরি রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিপরীত মতাবলম্বী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবিশ্বাস ও সন্দেহভাজন হয়ে বিশেষ কোনো ভাবনা সম্পন্ন প্রশাসক প্রান্তিকতায় পর্যবসিত হতে পারেন।

আমাদের প্রশাসকদের মধ্যে 'মুক্তিযোদ্ধা', 'অমুক্তিযোদ্ধা', বিশেষ বিশেষ সনের ব্যাচ,' 'বাম ঘেঁষা', 'ডান ঘেঁষা' ইত্যাদি বিভাজন সমস্যাকে প্রকট করে তুলেছে। এ সব বিভাজনজনিত বিবেচনা কখনো বা দক্ষতাকে তিরস্কৃত করে আবার কখনো বা অদক্ষতাকে প্রশ্রয় দেয়। অন্যদিকে 'লালফিতা ছিন্ন করে দেশের জন্য, দশের জন্য আত্মনিয়োগে' আমাদের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অনেকেই অপারগ। নীতি প্রণয়নকারী রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে সব রকম বিকল্প তুলে ধরার মানসিকতা এখনো তাঁরা অর্জন করেন নি। এখনো প্রশাসনিক কর্মকর্তারা রাজনৈতিক নেতৃবর্গকে চিহ্নিত করেন, 'শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী,' 'তদবির কারক' গোলমাল সৃষ্টিকারী হিসেবে (এমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশ- সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতি)। এ প্রসঙ্গে হামজা আলাভির একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"Even where they nominally exist, parliamentary institutions and political parties atrophy and effective power gravitates into the hands of those who are at the head of the state apparatus, and the bureaucracy and the military rather than the political parties are their primary source of power. India is often cited as the exception, a genuine parliamentary democracy in a peripheral capitalist society. But a close examination of Indian political system shows that the control of the bureaucracy by those at the head of the government has played a far greater role as the basis of state power, including the management of factions within the ruling party itself, than is generally (and superficially) acknowledged. Elsewhere the power of the bureaucracy and military is far more blatant. (Alavi Hamza, in Alavi, Hamza and Shanin Tudor, ed, sociology of Developing Societies, p 304).

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের মতো একটি অনুন্নত সমাজে রাষ্ট্রীয় বেতনভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা খাটো করে দেখার উপায় নেই। আমাদের মতো উপনিবেশ-উত্তর সমাজে এই গোষ্ঠীটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এরা অন্যান্য দেশীয় সামাজিক গোষ্ঠী অপেক্ষা অনেক দিক থেকেই ভিন্ন চরিত্রের। বিদেশী ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন ও বিদেশীদের আচার আচরণ রপ্ত করে স্বদেশবাসী থেকে তারা অনেকটা বিচ্ছিন্ন। অপর দিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুন্নত দেশের রাজনীতিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক কর্মকান্ড রাষ্ট্রযন্ত্রে তাদের নৈকট্য সুসংহত করবার জন্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি রাষ্ট্রই বৃহত্তম কর্মসংস্থানের উৎস। সুতরাং রাষ্ট্রযন্ত্রে দখল মজবুত করবার রাজনীতি মূলত সরকারি চাকুরিগুলো করায়ত্ব করার রাজনীতিতে পরিণত হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীটির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট হলো অঞ্চলগত, জাতিগত, বর্ণগত বা অন্য যে কোনো ভিত্তিতে ক্রমাগত ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়া অথচ এই উপদলগত বিভক্তি তাদের পাশ্চাত্যধর্মী শিক্ষার মূল মর্মগত চেতনার বিরোধী। রাজনীতির মধ্যবিত্ত ও রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্মকর্তা মধ্যবিত্ত যখন একে অপরকে নিজ নিজ অবস্থান মজবুত করার জন্য কাজে লাগাতে তৈরি হয় তখন দক্ষতা হয় নির্বাসিত, প্রতিভা হয় উপেক্ষিত নিয়ম- নীতি হয় লঙ্ঘিত। এই প্রয়াসে আত্মীয়তা, অঞ্চলগত সংহতি, ছাত্রজীবনের সখ্যসহ সব ধরনের সম্পর্কের দোহাই দেওয়া হয়। আদি সম্পর্কের দোহাই দেওয়ার এই সংস্কৃতি নৈর্ব্যক্তিক 'লিগ্যাল র‍্যাশনেল' আমলাতন্ত্র গড়ে তুলতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আরো দুঃখজনক হল যেসব কর্মকর্তা এই আদি সম্পর্ক পরিহার করে চলতে চান তাঁদের আমরা 'আমলা' বলে গাল দেই। আমাদের মতো সমাজে এ সমস্যাটি খুব প্রকট হলেও এটি কেবলমাত্র আমাদের সমাজেরই সমস্যা নয়। পাশ্চাত্যের উন্নত সমাজেও ক্লাব বা সোসাইটিকে কেন্দ্র করে 'নেটওয়ার্ক রিলেশন' গড়ে ওঠে যার সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়া প্রায় একই প্রকৃতির। তবে সেসব সমাজে বাজারের শক্তি এতই প্রবল যে, 'নেটওয়ার্ক রিলেশনের' মাধ্যমে অর্জিত আনুকূল্য বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। অনুন্নত দেশের বাজারের কথা বলতে গিয়ে ভারতের ঝানু আমলা ও অর্থনীতিবিদ ভিজয় জগন্নাথন বলেছেন 'প্রমিত নব্য ধ্রুপদী অর্থনীতির অনুমান অনুযায়ী স্বচ্ছন্দ গতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এসব দেশের বাজার সংগতিপূর্ণ হয় না। উপকরণ ও উৎপন্নের বাজারে লেনদেনকারীদের মধ্যে তথ্য সাধারণত দুস্প্রাপ্য এবং প্রায়শই অসম্পূর্ণ। কেননা পাশ্চাত্য ধাঁচের প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে আংশিকভাবে বিকশিত অথবা অবিকশিত। উৎপাদন ও বিনিময়ের সময় অসম্পূর্ণ তথ্যের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্যক্তিগত লেনদেনের নানা ধরনের উহ্য ও অপ্রাতিষ্ঠানিক চুক্তির পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ সব চুক্তি ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন পরিমাণে অর্থনৈতিক 'খাজনা' সৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

ও আহরণে সহায়তা করে। এই সমস্যার মূল আইনগত ও প্রশাসনিক অসম্পূর্ণতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে। সেকেলে আইন ও নিয়ম দ্বারা অনেক সময় অর্থনৈতিক লেনদেনে ওপর নজর ও পাহারা দেওয়া যায় না। এবং তা প্রত্যেকের জন্য সমান সুযোগের নিশ্চয়তা দেয় না। (N. Vijay Jagannathan, Informal Markets in Developing Countries, p3, OUP).

উইলিয়াম নিসকানেন (The American Economic Review:58, May, 1968: 293-305) আমাদের আরো কিছু মৌলিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে উৎসাহিত করেছেন। জন-প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রধান এপ্রোচ হল দক্ষতা অর্জনে অভিলাষী আমলাদের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো, তথ্যের আদান-প্রদান ব্যবস্থা ও বিশ্লেষণের যোগান দেওয়া। এই এপ্রোচে আমলার ব্যক্তিগত লক্ষ্য কীভাবে আমলাতন্ত্রের দক্ষতার সঙ্গ সংগতিপূর্ণ হবে তা দাঁড় করানোর জন্য বা খোলাখুলিভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেই। বর্তমান যুগে অনেক কর্মকাণ্ড ব্যুরোর মাধ্যমে হয়। এ থেকে অনেক প্রশ্নের জন্ম হয়। 'আমলাতন্ত্রের' পৃথক বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? 'আমলাতন্ত্র' সংক্রান্ত তত্ত্বের মৌল উপাদানগুলো কী কী? কী ধরনের বহিস্থ অবস্থায় আমলারা কিসের সর্বোচ্চ সম্ভব মাত্রা অর্জন করতে চায়? এই পরিস্থিতিতে এই আচরণের পরিণতি কী? প্রদত্ত চাহিদা ও ব্যয়ের নিরিখে একটি ব্যুরোর ভারসাম্য উৎপাদন কি? প্রদত্ত চাহিদা ও ব্যয়ে পরিবর্তন হলে উৎপাদনে কী পরিবর্তন হয়? 'আমলাতান্ত্রিক' সংগঠনের মাধ্যমে উৎপাদনের জনকল্যাণগত প্রতিক্রিয়া কী? সংগঠন ও পারিতোষিক কাঠামোয় কী পরিবর্তন আনলে আমলাতন্ত্রের দক্ষতা বাড়বে? নিসকানেন তার মডেলে ব্যুরোর দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন:

১. আমলারা তাদের ব্যুরোর জন্য প্রদত্ত চাহিদা ও ব্যয়ে সর্বোচ্চ বাজেট মাত্রা অর্জন করতে চায়। তাদের প্রতিবন্ধকতা হল ভারসাম্য উৎপাদনে বাজেট সর্বনিম্ন মোট ব্যয়ের সমান বা অধিক হবে।

২. ব্যুরো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বাজেটে এক বা একাধিক ধরনের সুনির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে।

ব্যুরোর উপযোগিতা অপেক্ষকে থাকে বেতন, ভাতা, জনগণের মধ্যে সুনাম-সুখ্যাতি, ক্ষমতা, আনুকূল্য বিতরণ, আয়াসসাধ্যভাবে ব্যুরো পরিচালনা এবং সহজভাবে পরিবর্তন আনার সুযোগ। এর সবকিছুই ব্যুরো বাজেট যে হারে বাড়বে সে হারেই বাড়বে বলে অনুমান করা হয়। যেসব আমলা সুনাম- সুখ্যাতির চাইতে আর্থিক প্রণোদণাকে কম গুরুত্ব দেন তাঁদের জন্যও সর্বোচ্চ বাজেট অর্জনকে পরোক্ষ মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা যায়। সাম্প্রতিককালে লক্ষ করা গেছে, অত্যন্ত খ্যাতি সম্পন্ন আমলারাও তাঁদের ব্যুরোর বাজেট যথেষ্ট মাত্রায় বাড়িয়ে নিয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

ব্যুরোগুলো প্রতি এককভিত্তিক উৎপাদনের পরিবর্তে উৎপাদনের সঙ্গে মোট বাজেটের বিনিময় ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু এই আচরণের ফলাফল নিয়ে ভাবা হয় না। এতে ব্যুরোগুলো এমন এক ধরনের বাজার ক্ষমতার অধিকারী হয় যা একমাত্র একচেটিয়া বাজারের সঙ্গে তুলনীয়। ভোক্তাকে বলা হয়, এ দামে হয় সবটা নাও, না হলে মোটেও নিও না। এভাবে ব্যুরো ভোক্তার উদ্বৃত্তের পুরোটা কেড়ে নিতে পারে।

আমলাতন্ত্রের উপর্যুক্ত অর্থনৈতিক আচরণ না বুঝলে আমলাতন্ত্রকে সংস্কার করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের দেশে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তা দূর করার জন্য এক গাদা সুপারিশ হাজির করাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পলিসি নির্ধারণের জন্য কিছু তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রয়োজন, তা আমরা প্রায়শই বিস্মৃত হই। এই প্রবন্ধে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার আলোকে সমস্যার মূল অনুসন্ধানের একটা প্রয়াস চালান হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের প্রশাসন জগতে দক্ষতা সম্পর্কে আরো একটি বিরাট বিভ্রান্তির উৎস হল সঠিককাজে সঠিক লোকটিকে নিয়োগের চিন্তা না করা। তুলনামূলক সুবিধা তত্ত্বের একটি অতি পরিচিত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক স্যামুয়েলসন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর চাইতে অধিকতর গতিতে টাইপ রাইটার চালাতে পারেন। তা হলে কী তিনি টাইপিস্টের কাজ করবেন না নিজ গবেষণার কাজ করবেন। তিনি যদি টাইপিস্টের কাজটি বেছে নেন তা হলে সমাজের তথা জ্ঞানের জগতে কি অপূরণীয় ক্ষতি হবে ভেবে দেখেছেন কি? যাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রে গবেষণা করার কথা, যিনি টিস্যু কালচারের গবেষণা করবেন অথবা বাংলাদেশের মাটিতে সর্বোচ্চ অট্টালিকার কাঠামোগত ডিজাইন তৈরি করবেন- তাঁকে ফাইলপত্রের পাহাড়ের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে দেশের কতটুকু মঙ্গল হবে? তাঁকে অবশ্যই তাঁর প্রতিভা ও অবদানের জন্য যথার্থ মূল্য দিতে হবে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র এই দক্ষতার সার্থক মূল্যায়ন করেছে বলে মনে হয় না।

প্রশাসনের জবাবদিহিতা সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করাই ছিল বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে যে আলোচনা করা হয়েছে তা অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। প্রশাসনের সাংগঠনিক কাঠামোগত পরিবর্তন, প্রশাসনকে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণে আনা, প্রশাসনের জন্য যুগোপযোগী ম্যানুয়েল প্রণয়ণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম সহজীকরণ, কিছু কিছু কার্যক্রম সরাসরি বেসরকারিকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ অনেক কমিশন বা কমিটির প্রতিবেদনে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মৌলিক আর্থ-সামাজিক অসংগতি ও অপূর্ণতাকে সামনে রেখে গভীরভাবে কিছু ভাবা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

অনানুষ্ঠনিক চুক্তি ভিত্তিক যোগাযোগ অনেক প্রকার প্রশাসনিক অনিয়মের কারণ তাতে সন্দেহ নেই। অসংগঠিত ও বেআইনি বাজারের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তারা

www.nagorikpathagar.org

বদলি ও নিয়োগ বাগিয়ে নিতে পারেন। এ ধরনের সুযোগ দুর্নীতিকে বাড়িয়ে তোলে, এতে অদৃশ্য সম্পত্তির মালিকানা সৃষ্টি হয় এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে সর্বজনীন সুযোগের অধিকার ব্যহত হয়।

প্রশাসনের জবাবদিহিতার জন্য অনেকগুলো আমলাতান্ত্রিক পরিদর্শন বা পাহারাদারির প্রয়োজন হবে না যদি প্রশাসন সার্ভিসের বাড়তি চাহিদা ও বাড়তি সরবরাহের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা যায়। এ ছাড়া তথ্যের ক্ষেত্রে অপ্রতিসমতা থাকলে নানা ধরনের জাল-জোচ্চুরির উদ্ভব হতে পারে। এই অপ্রতিসমতা দূর করতে হবে।

সম্পত্তির অধিকার দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর করতে না পারলেও অনেক ধরনের রেন্টসিকিং এর উৎপত্তি হতে পারে। কৃষকের জমির মালিকানা অনেক সময় বিদ্যমান আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা দিয়ে নিশ্চিত করা যায় না। এ জন্য দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাকে শায়েস্তা করার তুলনায় জমি হস্তান্তর ও জমি নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কথা ভাবা যায়। টেলিফোনের ভুতুড়ে বিল, বন্দুকের লাইসেন্স কিংবা মোটরযানের লাইসেন্স এ সব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে ভূমি প্রশাসনের ক্ষেত্রে 'মুইদ কমিটি' রিপোর্টটি বাস্তবায়ন করতে পারলে গ্রাম বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়রানি ও আর্থিক অপচয়ের হাত থেকে রেহাই পেতেন। সাধারণ প্রশাসন কিংবা উন্নয়ন প্রশাসনের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তারা যদি বৈষম্যকারী একচেটিয়াবাদীর মতো আচরণ করতে না পারে তা হলে জবাবদিহিতার জন্য অনেক ব্যয়বহুল পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে না। পুলিশ প্রশাসনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো লক্ষ করা গেছে অনেক দারোগাই যত অপরাধীর সন্ধান ও খবর রাখেন ততটা নিজ উর্ধ্বতন বা সাধারণ্যে প্রকাশ করেন না। এ সব ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত সংস্থাসমূহকে জোরদার করা বা ক্ষমতা দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। সবশেষে, সামগ্রিকভাবে গণতন্ত্রকে যত ব্যাপকতর করা সম্ভব হবে প্রশাসন হবে ততই জবাবদিহিমূলক এবং রেন্টসিকিং এর পথও রুদ্ধ হয়ে আসবে।

আমরা আমাদের আলোচনা বাংলাদেশে বি সি এস এর নানা ক্যাডারের মধ্যে অন্তর্কলহের প্রসঙ্গ নিয়ে শুরু করেছিলাম। এই অন্তর্কলহ অবসানের উদ্দেশ্যে সমঝোতার পরিবেশ তৈরি করার জন্য আলোচনায় গতি সঞ্চার করতে হবে। অন্যদিকে প্রত্যেক কর্মকর্তার মেধা, যোগ্যতা ও তার আউটপুট নির্ধারণের জন্য যতাযোগ্য মানদণ্ড প্রযোগ করে নির্দিষ্ট কর্মকর্তা থেকে প্রাপ্ত সেবার ভিত্তিতে তার মূল্য প্রদানে সমতা ও ন্যায় বিচারের নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যে জাতি মেধা ও যোগ্যতাকে দাম দেয় না সে জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। অপরদিকে রাজনীতিকরা আমলাদের ওপর কতটুকু নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন তা নির্ভর করবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টেকসই করার জন্য তাঁরা সবাই মিলে কী ভূমিকা পালন করছেন। গণতন্ত্র টেকসই না হলে আমলা- প্রাধান্য কাটিয়ে

www.nagorikpathagar.org

ওঠা যাবে না। মনে রাখতে হবে, সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে আজ পর্যন্ত কোনো দেশেই আমলাদের পরিহার করা সম্ভব হয় নি। আমাদের দেশে প্রশাসক, ডাক্তার, প্রকৌশলী নির্বিশেষে যাঁরাই রাষ্ট্রীয় সার্ভিসে যুক্ত আছেন তাঁরাই আমলা, কেননা তাঁদের হাতে একটা ব্যুরো রয়েছে। আমরা নির্মাণ কাজের মান নিয়ে অনেক দুর্নীতির কাহিনী শুনি। অথচ যদি নির্মাণ কাজের মান সার্টিফাই করার জন্য বেসরকারি ফার্মের হাতে দায়িত্ব দেওয়া যায় এবং সেইসঙ্গে দায়িত্বহীনভাবে অথবা দুর্নীতি করে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য ক্ষতিপূরণের শক্তিশালী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা যায় তা হলে নির্মাণ কাজগুলো অনেক ভালো হবে আশা করা যায়। তেমনিভাবে ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসায় অবহেলার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায় করার আইন জোরদার করার কথা ভাবা যায়। আমলাদের দুর্নীতির জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থার চাইতে বড় অঙ্কের জরিমানা আদায় করার কথা ভাবা যেতে পারে।

আমি আলোচনা শেষ করব ভারতের দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় কবি ও দার্শনিক তিরুভাল্লুভরের (খ্রি. পূ ২য় শতক - ৮ম শতক?) বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি কুরাল' থেকে Employment সংক্রান্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র উদ্ধৃতি দিয়ে : —

511
Scan the good and the bad, and employ
those who have done good
513
Loyalty, wisdom, a clear head and contentment
The four well posessed are the right qualifications
514
Many pass all tests and yet
Change in office
515
To prefer personal loyalty to knowledge and diligence
Is not the way to employ
517
Assured this man will do this task this way
Leave it to him
518
Having found the man for the task
Make him responsible
520
Let the King be alert, his servants upright
And the state will not swerve

www.nagorikpathagar.org

ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের উৎস

বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ভুটান নিয়ে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামো গড়ে তোলার সকল আয়োজন যে সম্পন্ন হবার পথে তা আঁচ করা কঠিন নয়। সম্ভবত আগামী মার্চের মাঝামাঝি সময়ে এই প্রস্তাব বাস্তবতায় রূপ লাভ করলে অবাক হবার কারণ থাকবে না। অনেকেই মনে করেন, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির পঁচিশ বছর মেয়াদ ফুরাবার সঙ্গে সঙ্গেই এমন ধরনের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশের বৃহৎ প্রতিবেশী ভারত অনুভব করছে। ইতোমধ্যেই কথা উঠেছে যোগাযোগ, যাতায়াত ও আন্তঃসীমান্ত সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনে অর্থবহ সহযোগিতা হতে পারে। সংবাদে প্রকাশ উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্পর্কে নেপাল প্রস্তাবপত্র দিয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে সরাসরি প্রস্তাব আসলে সন্দেহের কারণ হতে পারে, তাই নেপালকে দিয়ে বলানো হচ্ছে। মানতেই হবে, অতীতের তুলনায় ভারতের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার (একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ সরকার হওয়া সত্ত্বেও) বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ক্ষুদ্র প্রতিবেশীদের ব্যবহার করছে।

ভারত সরকার দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ব্যাপারে এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, যাতে মনে হতে পারে, ভারত তার সম্প্রসারণবাদী ধ্যান-ধারণা ও অভ্যাসগুলো ক্রমান্বয়ে পরিত্যাগ করতে চলেছে। সম্প্রতি গঙ্গা নদীর পানি বন্টন নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের পর এ দেশের অনেক সরলমনা দেশপ্রেমিকও ভাবতে শুরু করেছেন, ভারতের এই পদক্ষেপ সত্যিই আন্তরিক। অনেকে মনে করেন, স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সকল দেশ যখন বিরোধ মিটিয়ে ফেলার তাগিদ অনুভব করছে সে ক্ষেত্রে ভারত সঙ্গত কারণেই সেই প্রক্রিয়ায় শামিল হয়েছে। সম্প্রসারণবাদের ছুরিকা পরিত্যাগ করে গৌতম বুদ্ধে পরিণত হওয়া কি ভারতের জন্য এতই সহজ? যাঁরা ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও এর স্বার্থবাদী মহলগুলো সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাঁরা কিন্তু অত সহজে ভারতের আচরণ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন মেনে নিতে চাইবেন না। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে শিল্প ও প্রযুক্তির ভিত প্রভূতভাবে বিকশিত হয়েছে। বিকশিত হয়েছে এর সেবা খাত এবং তৎসঙ্গে এর সেনাবাহিনী। শিল্প, প্রযুক্তি, সেবা ও সেনাখাতের বিকাশ জন্ম দিয়েছে একটি সংস্থাপন এলিটের। এই এলিটরা দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধাকে মজবুত করবার জন্য দেশের বাইরেও নিজেদের জন্য একটি ভূমিকা অর্জন করতে তৎপর। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যে দর্শনে বিশ্বাস করতেন সে দর্শনই এই এলিট শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ অর্জনের আদর্শগত হাতিয়াররূপে কাজ করেছে। জিডিএইচ কোলের Supra-national area'র ধারণা নেহরু গ্রহণ

www.nagorikpathagar.org

করেছিলেন। কোলে মনে করতেন, ভারত হবে সুপ্রা ন্যাশনাল স্টেটের কেন্দ্র। এই স্টেটের বিস্তৃতি হবে মিসর থেকে 'সোভিয়েত' সীমান্ত পর্যন্ত। নেহরু লিখেছেন, But if people are foolish enough to avoid world unity and some world organization, then these vast supra-national regions, each functioning as one huge state but with local autonomy state but with local autonomy, are very likely to take shape. For the small state is doomed. It may survive as a culturally, antonomous area but, not as an independent political unit. (Nehru, Discovery of India, p. 536, 1991) নেহরুর উদ্ধৃতিতে স্পষ্টতই লক্ষণীয়, নেহরু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পৃথক ও স্বাধীন সত্তায় মোটেও আস্থাশীল ছিলেন না। এ কারণে ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ভারতের আচরণ অবোধগম্য নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিগত শিল্প খাত এবং আমলাতন্ত্র সংশ্লিষ্ট ভারতীয় শাসক এলিটশ্রেণী মূলত জওহরলাল নেহরু অনুসৃত আত্মমুখীন মিশ্র-অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফসল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে উন্নয়ন এবং দেশ রক্ষা ও সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বর্ধিত বরাদ্দ সামরিক-আমলা এলিট চক্রকে ভারতীয় শাসক এলিট গোষ্ঠীর নিয়ামক শক্তিতে পরিণত করেছে। সকল সরকারের আমলেই এই এলিট চক্র অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে প্রবল ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই এলিটরা নিজস্ব নিরাপত্তাকে জাতীয় নিরাপত্তা হিসেবে হাজির করে এবং নিজস্ব সুবিধাজনক অবস্থানকে বিশ্বসভায় ভারতের শক্তিশালী অবস্থান অর্জনের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে। টাইম পত্রিকার ভাষায় বলতে হয়-"to persuade the world to give India its rightful place in international dipolmacy" (Time, April 3, 1989). বিশ্বসভায় এই যোগ্য আসন লাভের নেশায় দেশ রক্ষা খাতে বল্গাহীনভাবে ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে। কখনো কখনো তা সরকারের সাধ্য সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। ১৯৮২ সালের পর সামরিক গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ চার গুণ হয়েছে। পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। বিদেশ থেকে উন্নতমানের অস্ত্র ক্রয় করা হচ্ছে। ১৯৮৬ সালের পর ভারত পৃথিবীর বৃহত্তর অস্ত্র আমদানিকারক দেশ। ১৯৮৭ সালে ভারত ৫.২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের অস্ত্র আমদানি করেছে, যা ইরাক ও ইরানের সম্মিলিত আমদানির দ্বিগুণ এবং পাকিস্তানের তুলনায় বার গুণ। উন্নতমানের অস্ত্র কেনার উদ্দেশ্য ভারত পৃথিবীর অস্ত্র বাজারে অস্ত্র রপ্তানিকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ভারত এখন পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম সেনাবাহিনীর অধিকারী। আর এ কারণেই ভারতীয় শাসক এলিটদের কট্টরপন্থীরা ভারতের প্রতিবেশী ও সাংস্কৃতিকভাবে নৈকট্যপূর্ণ অঞ্চলগুলোকে নিজ রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করার জন্য রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মনোভাব ব্যক্ত করতে দ্বিধান্বিত হচ্ছে না।

www.nagorikpathagar.org

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই ভারত একটি প্রধান সামরিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন দেখে আসছে। ভারতের সামরিক শক্তি যতই বাড়ছে (আণবিক সক্ষমতা অর্জনসহ) এর শাসক এলিটরা ততই ক্ষমতার মোহে মত্ত হয়ে উঠছে। এই এলিটরা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন—কী প্রশাসনে, কি সামরিক বাহিনীতে, কি গণমাধ্যমে, কি শিল্প প্রতিষ্ঠানে—এদের স্বার্থের মধ্যে রয়েছে একটা আন্তঃসম্পর্ক। এই এলিটগোষ্ঠী এক প্রকার স্বনিয়ন্ত্রিত ও প্রভুত্বপরায়ণ। জীবনদৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এরা অংশত আধুনিক, অংশত মধ্যযুগীয় এবং মূলত হিন্দু। এরা আক্রমণাত্মকভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব জাহির করতে চায়। নিজস্ব মতের প্রতি এদের শ্রদ্ধা নেই এবং ক্ষমতার কূটনীতিচর্চায় এরা প্রচণ্ড রকম উৎসাহী। এই ক্ষমতার কূটনীতির মানে কী? একজন প্রাক্তন কূটনীতিকের মতে, আমরা পছন্দ করি বা না করি–ভারতকে উপ-আঞ্চলিক ব্যবস্থায় নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, ভারতই একমাত্র দেশ যা এই ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম। এই অঞ্চলে পাকিস্তানসহ কেউই টুকরোগুলো কুড়িয়ে তুলতে পারবে না, যদি কোনো গোলযোগ বেঁধে যায়। এই কূটনীতিক মনে করেন, ভারতকে যদি কেউ দুর্বলের প্রতি ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন তা হলে ভারতের উচিত হবে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য বিবৃতি প্রদানের পরিবর্তে এসব গ্রাহ্য না করা। ভারত ক্ষমতার কূটনীতির পরিমণ্ডলে নতুন প্রবেশ করেছে। অথচ ব্রিটিশ ও ফরাসিরা এ ধরনের সমালোচনা গ্রাহ্য না করার ব্যাপারে বহুকাল ধরে অভ্যস্ত— সম্ভবত এরা অতীতে উপনিবেশবাদী ছিল বলেই এসব ব্যাপারে আমল দেয় না। সুতরাং মন-মানসিকতায় ভারতীয় শাসক এলিটরা অতীতের সাম্রাজ্যবাদীদের পদাঙ্ক অনুসরণে উৎসাহী। এ ধরনের এলিটদের কাছে সম্প্রসারণবাদী নীতির কোনো ব্যত্যয় আমরা আশা করতে পারি কি? ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে এক পর্যায়ে ভারতীয় শাসক এলিটরা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পর্যবসিত করে প্রথমবারের মতো ভারতকে সামরিক দিক থেকে অপ্রতিরোধ্য প্রমাণে সক্ষম হয়। যদিও এই যুদ্ধের হোতা কোন পক্ষ তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে তবুও এর ফলাফল সম্পর্কে তেমন বিতর্কের অবকাশ নেই। বস্তুত ১৯৬২-এর চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধের পর থেকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নটি ভারতীয় বিদেশ নীতি ও প্রতিরক্ষা নীতির চূড়ান্ত বিবেচ্যে পরিণত হয়। সেদেশে পত্রিকার সম্পাদক, সাংবাদিক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ক্ষমতার কূটনীতি অধ্যয়ন ও সমীক্ষণের জন্য ব্যক্তিবর্গের কমতি নেই। জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টি সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘন ঘন জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল এ বিষয়ে শাসক এলিটদের নিরাপত্তা ভাবনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করা। অন্যদিকে

www.nagorikpathagar.org

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিজ ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তোলার উদ্দেশ্যে বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রচারণায় ভারত তৎপর হয়েছিল। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সর্মথনদান ও নেলসন মেন্ডেলার কারামুক্তির দাবির প্রতি সমর্থন ভারতের শান্তিবাদী মুখোশ ধারণের সহায়ক হল। এই মুখোশ তার সম্প্রসারণবাদী মুখচ্ছবি অনেকাংশে ঢেকে দিতে সক্ষম হল। জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর একটি অতিরিক্ত সম্মেলনে স্বাগতিক দেশের ভূমিকা পালন, আফ্রিকা তহবিলে সভাপতির ভূমিকা, ৬ জাতি শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ ঘোষণায় স্বাক্ষরদান ও জাতিসংঘে ২০১০ সনের মধ্যে আণবিক অস্ত্র এবং সামগ্রিকভাবে অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ে তোলার আহ্বান- এর সবই ভারত করেছে গৌতম বুদ্ধের ভাবমূর্তি অর্জনের জন্য। কিন্তু যেই মুহূর্তে আমরা প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের আচরণের ওপর দৃষ্টিপাত করি তখনি স্পষ্ট হয়ে যায় আঞ্চলিক প্রভুর মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার অভিলাষ তার কত তীব্র। ভারতীয় শাসক এলিটদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে আচ্ছন্নতা বোধ তাদেরকে মানসিকভাবে নিরাপত্তাহীন করে ফেলেছে। তারা তাদের রাষ্ট্রের প্রতিটি সীমান্ত থেকে বিপদের আশঙ্কায় মগ্ন। গণচীনের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে রয়েছে অস্বস্তি। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেনজির ভুট্টোর সরকার পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসা সত্ত্বেও পাকিস্তান ভীতি থেকে তারা মুক্ত হতে পারে নি। এমনকি ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো ভারতের বৈরী শক্তিসমূহের আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য হতে থাকল। ত্রিনকোমালিতে মার্কিন বেতার প্রচার কেন্দ্র, মালদ্বীপে ব্যর্থ অভ্যুত্থান, কিংবা নেপাল কর্তৃক ভারতীয় পণ্যের ওপর কর আরোপ পাকিস্তানের আণবিক ক্ষমতা অর্জনের তুলনায় কম বিপজ্জনক প্রতীয়মান হল না। এ রকম মানসিক নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ প্রতিবেশীদের প্রতি নীতি-নির্ধারণে শাসক এলিটদের মধ্যকার কট্টরবাদীদের ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রে প্রাধান্য বিস্তারের পথ খুলে দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিশ্ব পরিস্থিতিও কট্টরবাদীদের জন্য বিচরণ ক্ষেত্র নির্মাণ করেছে। স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা প্রশমন, পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজমের পতন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের প্রতি ইউরোপের অন্যান্য শক্তির মনোযোগ নিবদ্ধকরণ, গণচীনে গণতন্ত্রবাদীদের আন্দোলন, আঞ্চলিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিগুলোর অনীহা এসবের সব কিছুই ভারতকে তার প্রতিবেশীদের প্রতি স্বেচ্ছাচারী আচরণে উদ্দাম করে তুলেছে। ভারত এখন প্রতিবেশীদের প্রতি তার সমস্ত অভিসন্ধি বাস্তবায়নে প্রায় বাধামুক্ত। ভারতের অভিসন্ধিগুলো তা হলে কি? সিকিমের প্রশ্ন বাদ দিলে নতুন করে ভারতের পক্ষে ভূখণ্ড বিস্তার হয়তো সম্ভব নয়, কিংবা সৈন্য পাঠিয়ে দেশ দখলও হয়তো সম্ভব নয়। সম্প্রতি নেপাল-ভুটানের বাইরে বাংলাদেশেও ভারতের একটি বড় বাজার তৈরি

www.nagorikpathagar.org

হয়েছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতির বাধ্যবাধকতার কারণে ভারতীয় পুঁজিপতিরা আশপাশের দেশে বিনিয়োগের কথা ভাবতে শুরু করেছে। তা ছাড়া রয়েছে নিজের গৃহবিবাদে অন্য রাষ্ট্রকে জড়িয়ে ফেলে রণকৌশলগত সুবিধা অর্জন। নিজস্ব গৃহবিবাদ দমন করতে পারলে অর্থনৈতিক বাজার বিস্তারের কাজটি সহজ হয়। আর সে কারণেই নিজ প্রতিবেশীর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নস্যাৎ করে হলেও নিজেকে নিরাপদ করে তুলতে হবে। কিন্তু সে নিরাপত্তা অর্জনের উপায় কী? ভারতের স্ট্রাটেজিক দৃষ্টি মরিশাস থেকে ফিজি, মিয়ানমার থেকে আকসাই চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু তার আশু লক্ষ্য হল এমন একটা ব্যবস্থা, গড়ে তোলা যাতে করে ভারতের নিরাপত্তার সঙ্গে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরিপূরক হয়। আর এই জন্যই সম্ভবত সুকৌশলে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামোর কথা পাড়া হচ্ছে। এই কাঠামোয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সম্পদ সমাবেশের সুগার কোট (Sugar Coat) দেওয়া হয়েছে আঞ্চলিক বিদ্রোহ দমনের তিক্ততা গলাধঃকরণ সহনীয় করতে। ভারতের বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ অনিরুধা গুপ্তার মতে, ভারত দক্ষিণ এশিয়ায় একটি ব্রাহ্মণ্য ক্ষমতা কাঠামো নির্মাণ করতে ইচ্ছুক— যে কাঠামোয় ভারতের ভূমিকা ব্রাহ্মণের। প্রতিবেশীরা শক্তি– সামর্থ্য অনুসারে কেউবা নিম্ন জাতিভুক্ত আবার কেউবা মধ্যবর্তী জাতিভুক্ত। তবে এ ক্ষমতা কাঠামোয় পাকিস্তান একান্তভাবেই সংশোধন ও স্পর্শলাভের অযোগ্য এক অসুর। বাংলাদেশে যাঁরা সার্বভৌম সমতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে ভারতকে সত্যিকার বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চান তাঁরা নিশ্চয়ই চাইবেন ভারত ক্ষমতার কূটনীতিচর্চার অবসান ঘটাবে।

www.nagorikpathagar.org

ইসলামী আন্দোলনের স্বরূপ বিচার

ইসলাম 'আধুনিকতা বিরোধী', 'প্রগতি বিরোধী' এবং 'গণতন্ত্র বিরোধী'— এরকম দৃষ্টিভঙ্গি আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যক্ষ করে আসছি। পাঁচ শ বছর আগে পাশ্চাত্যে ইসলামের যে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত ছিল তার অবসান ঘটে। এর আগে থেকেই পৃথিবীতে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে–না পাশ্চাত্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে সে নিয়ে দ্বন্দের সূচনা হয়েছিল। ইসলামী দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে গিয়ে পাশ্চাত্য দাবি করেছে মুসলিম শাসকরা (আরব হোক অথবা অটোমোন তুর্কি হোক) রাষ্ট্র পরিচালনা করতে অপারগ এবং সামাজিক সম্পর্কগুলো বুঝতে অক্ষম। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ইসলামী দুনিয়া পাশ্চাত্যের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ শাসন, নিয়ন্ত্রণ ও আনুগত্যাধীন হয়ে পড়ে। মিসর, আলজেরিয়া, সুদান, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশে পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। এই প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য ছিল জিহাদি মেজাজের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে ইসলামী বিশ্বের বহু দেশেই শিক্ষা, সামরিক, আমলাতান্ত্রিক ও আইন ব্যবস্থার ওপর ইউরোপীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কূটনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে ইসলামী বিশ্বের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ দারুণ অবক্ষয় কবলিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই বোঝা গেল, ইসলামী বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের পক্ষে পাশ্চাত্যের এই আগ্রাসন প্রতিহত করা সম্ভব নয়। আরব দেশের মতো ভূখণ্ড যা ইউরোপীয়করনের আওতামুক্ত থেকে গেল, কেবলমাত্র সেখানেই ইউরোপীয়করনের প্রভাব অনুভূত হল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আরব দেশে ওয়াহাবি মতবাদে বিশ্বাসী সুন্নি বিশুদ্ধবাদীরা কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার আলোকে একটি কঠোর সাধনাধর্মী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। সউদি গোষ্ঠী ও ওয়াহাবিদের সম্মিলিত প্রয়াসের ফল ছিল এই নতুন রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। পেট্রোলিয়াম সম্পদের আবিষ্কার ও এর উত্তোলনের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। এই ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত সউদি আরবে আক্ষরিক ও প্রতীকী অর্থে বিধর্মী প্রভাবকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাধারণভাবে মুসলিম দেশসমূহের রাজনীতিতে পশ্চিমা ধাঁচের আধুনিকায়নের সূচনা হয়। রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ এবং রাষ্ট্রবাদ (Statism) পাশ্চাত্য ধাঁচের আধুনিকায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯১৮ সালে অটোমোন সাম্রাজ্যের পতন ও ১৯২৪ সালে ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কের অভ্যুদয়ের ফলে আধুনিকায়নের এই জোয়ার প্রবল হতে শুরু করে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নীতির প্রতি আস্থাশীল নেতৃত্ব (যাদের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

কেউ কেউ সামরিক বাহিনী থেকে উত্থিত হন) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মালিক হয়ে বসেন। 'কো-অপশনে'র (Co-option) মধ্যদিয়ে এসব নেতারা ধর্মীয় নেতাদের নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস পান। রাষ্ট্রের শীর্ষ দেশে পরিবর্তন আসলেও মুসলিম বিশ্বের সামাজিক জীবনে তেমন কোনো পরিবর্তন আসে নি। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন ধর্মীয় মূল্যবোধ ও উলেমাশ্রেণী কর্তৃক অব্যাহতভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। এসব দেশের নতুন শাসকরা ন্যায়পরায়ণতা এবং দক্ষতার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন। তাদের শাসনে ইসলামী নিয়মনীতি লেশ মাত্র ছিল না।

রাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকা সব ক্ষেত্রে ও সবসময় একই ধরনের ছিল না। ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মাপকাঠিতে ইসলামী দেশগুলোতে ইসলামের রাজনৈতিক ভূমিকায় ব্যাপক বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম কখনো শাসকগোষ্ঠীর শাসন ক্ষমতাকে ন্যায্যতা প্রদান ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কখনো বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিপ্লবের চালিকাশক্তি রূপে কাজ করেছে। ইরান, মরক্কো, সউদি আরব, পাকিস্তান ও সুদানে শাসন ক্ষমতায় যে ইসলামকে দেখতে পাওয়া যায় তা মূলত রাজনৈতিক এলিট গোষ্ঠীর ক্ষমতাকে ন্যায্যতা প্রদানেরই প্রয়াস। এসব দেশের সরকারগুলো ইসলামকে মূলত তাদের নিজস্ব অবস্থানকে জোরদার করবার কাজেই ব্যবহার করে থাকে। সমাজকে কতগুলো নীতিবোধের ভিত্তিতে সংঘটিত করার কাজটি এসব দেশে মুখ্য ভূমিকা অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। ক্ষমতায় পাকাপোক্তভাবে আসীন এমন শাসকদের বিরুদ্ধে যেসব ইসলামী আন্দোলন হচ্ছে, তা জনপ্রিয় ইসলামের দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করা যায়। ১৯৩০-এর দশকে এ ধরনের আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। সুন্নি মতাবলম্বী ধর্মীয় পণ্ডিতরা আধুনিক যুগে ইসলামী রাষ্ট্র কীভাবে গড়ে তোলা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছেন। এদের মধ্যে সিরিয়ার মুহাম্মদ রশিদ রিদা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। ১৯৩৫-এ তার মৃত্যু হয়। তার চিন্তা-ভাবনা মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ ও জামায়াতে ইসলামীর ওপর প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করে। আয়াতুল্লাহ্ খোমেনি যে ইসলামী রাষ্ট্রের চিন্তা করেছিলেন তার সঙ্গে রশিদ রিদার চিন্তা-ভাবনার উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। রিদার মতবাদ অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য দুটি আবশ্যকীয় শর্ত বিদ্যমান : প্রথমত, রাষ্ট্রে ইসলামী নেতার নেতৃত্ব কায়েম, দ্বিতীয়ত, শরীয়া আইনের একক প্রাধান্য। জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে রিদার বক্তব্য হল– শাসক ও শাসিতের মধ্যে আলাপ-আলোচনার (Consultation) ব্যবস্থা চালু হলে ইসলামী রাষ্ট্র চরিত্রের দিক থেকে কার্যত হবে গণতান্ত্রিক। কারণ, রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুগপৎ ইসলামী আইন বিশারদদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলবেন। ইসলামী আইন বিশারদদের পরিষদ মুসলমানদের মধ্যকার সকল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকরের মৃত্যুর পর হযরত উমর যে মডেলের ইলেকটোরাল কাউন্সিল গঠন

www.nagorikpathagar.org

করেছিলেন, ইসলামী আইন বিশারদদের কাউন্সিল হবে তারই অনুরূপ। এর ফলে যিনি রাজনৈতিক নেতা, তিনি ধর্মীয় নেতাও হবেন– তিনি সকল মুসলমানদের প্রধান। যতদিন পর্যন্ত ইসলামের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হবে ততদিন পর্যন্ত জনসমর্থনও বহাল থাকবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতা যাতে স্বৈরাচারী না হয়ে পড়ে সেজন্য আলেম-ওলামারা নিশ্চিত করেন যাতে গণতন্ত্র বহাল থাকে। এ প্রসঙ্গে ১৮৯২ ও ১৯০৬ সালে ওলামাদের নেতৃত্বে পরিচালিত ইরানের দুটি বিদ্রোহের কথা রিদা উল্লেখ করেছেন। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তিনি শরীয়ার প্রাধান্যের কথা বলেছেন; কিন্তু যেসব সমসাময়িক সমস্যার ব্যাপারে শরীয়া আলোকপাত করে নি সেসব ক্ষেত্রে 'কানুন' তথা শরীয়াত চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিয়মনীতির দ্বারা এসব প্রশ্নের সমাধান করা হবে। মিসর, সুদান, উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাপেক্ষে রিদার মডেল গ্রহণ করে। যতদূর সম্ভব ঐকমত্যের ভিত্তিতে শরীয়া আইন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, অন্যথায় জঙ্গি, সশস্ত্র বিপ্লবের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। ১৯৩০-এর দশক থেকে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত সময়কালে মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ সর্ববৃহৎ ইসলামী গণআন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯৫০-এর দশকে প্রেসিডেন্ট নাসেরের সরকার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বিবেচনা করে মুসলিম ভ্রাতৃসংগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয় নি। চরম নির্যাতন সত্ত্বেও মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘ নিষিদ্ধ ঘোষণার ২০ বছরের মধ্যে একটি নতুন আদর্শিক ও সাংগঠনিক আন্দোলন রূপে দানা বাঁধে। এই আন্দোলন সমসাময়িককালের ইসলামী রাষ্ট্রের স্বরূপ জাহেলি শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ়তার প্রশ্নে অনেক বেশি বিপ্লবাত্মক।

মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের অনুসারীরা রাষ্ট্র থেকে ইসলামী সমাজকে পৃথক করার বিরোধী। এরা পাশ্চাত্য ও অনৈসলামী ভাবধারার আধিপত্যের ঘোর বিরোধী। অনৈসলামিক ও দুর্নীতিপরায়ণ শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদেরই প্রশ্নে এরা আপসহীন। এরকম র‍্যাডিক্যাল সুন্নী মুসলিম সংগঠন আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, মালয়েশিয়া, সিরিয়া, লেবানন, সউদি আরব, পাকিস্তান, তিউনিশিয়া এবং মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশে লক্ষ করা যায়। ইসলামী জঙ্গিবাদীদের বক্তব্য হল, যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর আইন চালু করা না হবে ততদিন পর্যন্ত কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। অনৈসলামী উৎসের ভিত্তিতে রচিত আইন ও বিধি-নিষেধ একজন ঈমানদারের জন্য কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সেসব দেশে মুসলমানদের সংহতি অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলাম বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। এসব দেশে বসবাসকারী মুসলমানদের দায়িত্ব হবে ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী জীবনযাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এসব ক্ষেত্রে আন্দোলনের লক্ষ্য মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র স্থাপন নয়, বরং ইসলামী বিধান মতে জীবনযাপনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। ভারত, নাইজেরিয়া,

www.nagorikpathagar.org

মিয়ানমার, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনের মতো দেশসমূহে এরকম ধারা প্রবল। তবে এসব আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদের উদ্ভব হবে না, তা নিশ্চিত নয়। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি তাকালে চার ধরনের মুসলমান আমরা দেখতে পাই। যথাক্রমে নাম সর্বস্ব, ঐতিহ্যমুখী, মূলধারা সংশ্লিষ্ট এবং জঙ্গিবাদী। যারা কেবল মুসলিম পিতা-মাতার সন্তান বলেই মুসলমান, তাদেরকে আমরা নামসর্বস্ব মুসলান বলতে পারি। যেমন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মুসলমান, যাদের শিরা-উপশিরায় ইউরোপীয় জীবনাচরণ দৃঢ়মূল হয়ে আছে। অবশ্য সাম্প্রতিককালে পাশ্চাত্যের মুসলিম সমাজে কমিউনিটি স্কুল, মসজিদ, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং স্বধর্ম অনুসারীদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ রাখার প্রচেষ্টায় ইসলামী স্বাতন্ত্র্যবোধকে জাগ্রত হতে দেখি। দ্বিতীয়ত, রয়েছে ইসলামী চর্চায় নিষ্ঠাবান মুসলমান। এরা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ অনুসরণ করে, তবে রাজনীতিকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে না। এদেরকে ইসলামী ঐতিহ্যমুখী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ ছাড়াও আছে ইসলামী সংস্কারবাদী বা ইসলামী উদারনীতিবাদীরা। তারা ইসলামী পরিকাঠামো বজায় রাখার পক্ষপাতী। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এরা পাশ্চাত্যের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে চায়– পাশ্চাত্য থেকে প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে চায়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ইসলামকে হতে হবে নমনীয় এবং সম্প্রসারণশীল। যার লক্ষ্য ইসলামকে পরিবর্তনশীল সময় ও স্থানের উপযোগী রূপ দেওয়া। এই তিনটির অন্তর্ভুক্ত কোনো গোষ্ঠীই ইসলামকে রাজনৈতিক বিশ্বাস বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে না। সবশেষে আছে সেই গোষ্ঠীটি, পাশ্চাত্য যাকে 'মৌলবাদী' আখ্যা দিয়েছে। তবে এদেরকে ইসলামপন্থী বলাটাই শ্রেয়। এদের কাছে ইসলাম যেমন একটি ধর্ম, তেমনি ইসলাম একটি রাজনৈতিক মতাদর্শও বটে। এরা তিনটি 'দ'-এর অনুসারী। প্রথমত, 'দ্বীন' (ধর্ম হিসেবে ইসলাম), দ্বিতীয়ত, 'দুনিয়া'র জন্য ইসলাম (জীবনযাত্রা হিসেবে) এবং তৃতীয়ত, 'দৌলা' অর্থাৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম। ইসলামপন্থীরা তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য বল প্রয়োগের কৌশল গ্রহণ করতে পারে বা নাও করতে পারে। কারো কারো মতে, ইসলামের জন্য জরুরি। কার্যত জিহাদ ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ। মিসরের 'আল জিহাদ' গোষ্ঠী, লেবাননের 'হিযবুল্লাহ গোষ্ঠী', আলজেরিয়ার 'ইসলামিক স্যালভেশান ফ্রন্ট', মরক্কোর 'আল শারিবা আল ইসলামিয়া' গোষ্ঠী, তিউনিশিয়ার 'আল নিহাব' গোষ্ঠী এবং আলজেরিয়া ও প্যালেস্টাইনের 'হামাস' গোষ্ঠী জিহাদি ইসলামে বিশ্বাসী। এরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ধরনের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত। মুসলমানরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের সঙ্গে ইসলামকে যুক্ত করা। অন্যদিকে মুসলমানরা সেসব দেশে সংখ্যালঘু যেসব দেশে ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য হল ইসলামের সঙ্গে রাষ্ট্রকে যুক্ত করা। আমাদের কালে ইসলামী আন্দোলনের যে শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি তা একদিকে পাশ্চাত্যের পরাজয় এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্যেরই আপাত কর্তৃত্বের প্রতি প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশী মন ও মানসিকতা

চীনের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই শেষ জীবনে একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। তাঁর মতে পৃথিবীর সকল খণ্ডিত জাতিসত্তা ক্রমান্বয়ে একীভূত হবে। সেই ভবিষ্যৎ বাণীর পর আমরা দেখতে পেয়েছি সত্যি সত্যি খণ্ডিত জাতিসত্তা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। দুই জার্মানির এবং দুই ইয়েমেনের একীভূত হওয়ার ঘটনা চীনা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার সফল ভবিষ্যৎবাণীর সার্থক উদাহরণ। একইভাবে ভবিষ্যতে দুই কোরিয়ার একত্রীকরণ এবং মূল ভূমি চীনের সঙ্গে তাইওয়ান এবং ম্যাকাও এর একত্রীকরণ খুব একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হবে না। এরই মধ্যে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র শক্তি আমেরিকার প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামও এক হয়ে গেছে। খণ্ডিত জাতিসত্তাগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পেছনে রয়েছে দুই অংশের জনগণেরই ঐকান্তিক মানসিক আকুতি এবং আকাঙ্ক্ষা। এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই অনেকের মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ একীভূত হয়ে কোনোদিন এক বৃহত্তর রাষ্ট্রে পরিণত হবে কি? সংশ্লিষ্ট উপাদান এবং আনুষঙ্গিক প্রশ্নসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে চৌ এন লাই এর সাধারণীকৃত ভবিষ্যৎ বাণী এক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয় এবং এই দুই জনগোষ্ঠীর একীভূত হওয়ার সম্ভাবনা একবারেই নেই। এই সত্য অনুধাবনের জন্য আমাদের 'বাংলাদেশী মানসিকতা' এবং 'পশ্চিম বঙ্গীয় মানসিকতা'র মধ্যে যে সব সুনির্দিষ্ট এবং অমোচনীয় পার্থক্য রয়েছে সেগুলোর নৈর্ব্যক্তিক পর্যালোচনা করা দরকার। এরই পর্যালোচনা শুধু দুই বাংলার জনগোষ্ঠীর মানসিকতার দুস্তর ব্যবধানই পরিষ্কার করে তুলবে না, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ (যা আমাদের অনেক নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবীই প্রত্যাখ্যান করে থাকেন) তত্ত্বের অন্তর্নিহিত যুক্তিও উন্মোচন করবে।

মানসিকতা তাৎপর্যপূর্ণ কেন?

বাংলাদেশী মানসিকতার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর আলোকপাতের আগে বিভিন্ন জাতি এবং রাষ্ট্রের ইতিহাস নির্মাণে মানসিকতা কেন তাৎপর্যপূর্ণ সে ব্যাপারে কিছু কথা প্রাসঙ্গিকভাবে বলে নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে, বিশেষ করে ফ্রান্সে বিশালতর আঙ্গিকে ইতিহাস রচনা শুরু হয়। কেউ কেউ একে নতুন ইতিহাস বলে আখ্যায়িত করেন, আর কেউ কেউ প্রত্যাখ্যান করেন। এই নতুন ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে চলে আসে বাণিজ্য অর্থনীতি; আর এই নতুন ইতিহাস বিনির্মাণে তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় পুরাতত্ত্ব এবং আইকনোগ্রাফির মতো নতুন নতুন উপাদান। এই ইতিহাস রচনার প্রক্রিয়ায় এমনকি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ঐতিহাসিক জনতত্ত্ব, পারিবারিক গঠন প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ও যুক্ত করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

এইভাবে নতুন ইতিহাস বিনির্মাণে প্রাসঙ্গিক সময়ের মানুষের বিভিন্ন ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, যেমন জীবন ও জন্ম-মৃত্যুর প্রতি মনোভঙ্গি, নর-নারীর আন্তঃসম্পর্ক, পিতৃ-মাতৃ পরিচয়ের পদ্ধতি ও উত্তরাধিকার নির্ধারণ পদ্ধতি সংযুক্ত হয়।

ইতিহাস রচনার প্রক্রিয়ায় ঐতিহাসিকগণ ষাটের দশকে এসে অর্থনীতি এবং পারিবারিক জীবনের দিকে আরো গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন। এ সময়ে থেকে কোনো জনগোষ্ঠীর ইতিহাস রচনায় তাদের মানসিকতার ইতিহাস এবং সেই সমাজে নিম্ন বর্গের মানুষদের মানসিকতার ইতিহাস প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে আমরা একটি উদাহরণ দিতে পারি। ফ্রান্সের নতুন ইতিহাস বিনির্মাণের জন্য পঞ্চাশের দশকে একটি নতুন উপাদান অনুসন্ধান করা হয় সেটা হল অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকে কী কী কারণে জন্মশাসনের ব্যাপক প্রসার ঘটে, বিশেষ করে কীভাবে তা শহরও গ্রাম উভয় এলাকায় বিস্তার লাভ করে। সমাজ বা গোষ্ঠীর সদস্যদের সামষ্টিক মানসিকতা অনুধাবনের উদ্দেশ্যে সে সময়কার বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিচার বিভাগীয় মোহাফেজখানা, গির্জার গ্রন্থাগার ইত্যাদির শরণাপন্ন হন ইতিহাসবেত্তাগণ। সমাজের অপরাধ প্রবণতার ওপর তথ্যাদির জন্য গবেষকগণ বিচার বিভাগীয় মোহাফেজখানার ওপর, সপ্তদশ শতকের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মূল্যবোধ এবং সেগুলোর প্রতি সমাজের মনোভঙ্গির ওপর আলোকপাতের জন্য ধর্মীয় সংগ্রহশালার ওপর নির্ভর করেন। এ ছাড়া সে সময়ে যাদুবিদ্যার ওপর মানুষের নির্ভরতা, সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং বিশেষ করে ক্যাথলিক সংস্কারের ব্যাপারে সমাজে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তাও পর্যালোচনা করা হয়।

যে কোনো সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক আচার-আচরণ ও আবেগপ্রসূত আচার-আচরণের মধ্যেকার ক্রমবর্ধমান সংঘাত ও (শেষ বিচারে যে সংঘাতে বুদ্ধিবৃত্তিজনিত যৌক্তিকতা আবেগজনিত সিদ্ধান্তকে অতিক্রম করে যায়) মানসিকতার ইতিহাস রচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এনসাইক্লোপেডিয়া ফ্র্যানচাইজ অষ্টম খণ্ড অনুসারে আবেগ অবশ্য সব সময়ই মানবীয় সংবদ্ধতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে কাজ করেছে, এবং এইভাবে একটু একটু করে বিভিন্ন ধরনের আবেগ মানুষকে সংঘবদ্ধ করে কখনো তারা উদ্যোক্তা কখনো অনুসরণকারী যা তাদের একটা সিস্টেম বা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসে। সে সিস্টেম একটি আন্তব্যক্তিক উদ্দীপনার ভিত্তিতে রচিত। অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিত ভেদে তা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে এবং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। একইভাবে তাদের মধ্যে সৃষ্ট ঐকতান ও অনুরূপ আবেগগত প্রতিক্রিয়াসমূহ তাদেরকে এক বৃহত্তর শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং অধিকতর নিরাপত্তা প্রদান করে। এইভাবে আবেগ-ভিত্তিক অর্থাৎ আবেগের তাড়নায় তৈরি একটি সামাজিক সংগঠনও যৌক্তিকতা অর্জন করে। প্রকৃত প্রস্তাবে আবেগসমূহ তখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ

www.nagorikpathagar.org

করে। কোনো ধর্মীয় আচার বা সামাজিক প্রথা বা আচরণ যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এইসব প্রাতিষ্ঠানিক সত্তাসমূহও একইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রাগৈতিহাসিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত অনেক আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই ছিল একই ধরনের অঙ্গভঙ্গি অথবা ধ্বনিসমূহের উচ্চারণের মাধ্যমে সবাইকে একই আবেগে উদ্বুদ্ধ করে বিশেষ কোনো সামষ্টিক কাজের জন্য প্রস্তুত করা।

আবেগগত তাড়না

সবচাইতে মৌলিক যে উপাদান বাংলাদেশের জনগণকে পশ্চিম বাংলার জনগণ থেকে আলাদা করেছে তা হল একটি নিরেট বাস্তবতা। এই বাস্তবতা হল বাংলাদেশের জনগণ নিজেদের প্রথমে এবং শেষেও বাংলাদশী হিসেবে গণ্য করে আর পশ্চিম বাংলার জনগণ প্রথমে নিজেদের ভারতীয় এবং পরে বাঙালি হিসেবে গণ্য করে। এই লেখকের একবার পশ্চিম বাংলার বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল। আলাপ প্রসঙ্গে জানা গেছে যে, ভারত থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা রাষ্ট্র গঠন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাদের মনের অবচেতনেও কাজ করে না। একইভাবে এটাও আমার মনে হয় আমাদের দেশে যারা বাঙালি জাতীয়তাবাদের সবচাইতে বড় প্রবক্তা তারাও বৃহত্তর বাংলার (দুই বাংলার একীভূত রূপ) ধারণা গ্রহণ করবেন না যদি তা ভারতের অঙ্গীভূত হওয়া বোঝায়। এ প্রসঙ্গে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পণ্ডিত ব্যক্তির কথা মনে পড়ে। তারা সমাজে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত। একবার তারা কলকাতা সফরে যান। তাঁরা আমার কাছে অকপটেরই স্বীকার করেন যে কলকাতাতে তাঁরা নিজেদের বাংলাদেশী বলেই পরিচয় দান করেন। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক বিপুল অংশ তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের, আবেগ অনুভূতির প্রতিধ্বনি খুঁজে পান রবীন্দ্রনাথের গানে, রবিশংকরের বাদনে অথবা সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্রে। কিন্তু তারাই আবার নিষ্ঠার সাথে মৃতের আত্মার মাগফেরাতের জন্য ফাতেহা পাঠ, দুই ঈদ পালন এবং মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে থাকেন। এগুলো তারা করে থাকেন মুসলমান হিসেবেই।

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে, বাংলাদেশী মানসিকতা গঠনে অনেক ক্ষেত্রেই যৌক্তিকতার চাইতে আবেগগত তাড়না বেশি কাজ করে। বস্তুতঃপক্ষে আমাদের জাতীয় জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে আমাদের জাতীয় আবেগের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলন সম্ভবত এ জাতীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে সবচাইতে বেশি উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশীদের মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো যে আবেগপূর্ণ বিস্ফোরণ ঘটে তা থেকেই বোঝা যায় বাংলাদেশী জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভের ক্ষেত্রে আবেগ কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে

www.nagorikpathagar.org

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, ভাষা আন্দোলনের আবেগ এতটাই তুঙ্গে ওঠে যে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান সমূহেও ইংরেজিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার প্রতিষ্ঠা এ কারণে যত সুগমই হোক না কেন এতে শিক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকমান অর্জন বাধাগ্রস্থ হয়েছে নিঃসন্দেহে।

যৌক্তিক মানসিকতা

যেখানে বাংলাদেশীদের ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই এ ধরনের আবেগতাড়িত মানসিকতা দ্বারা প্রভাবিত এমনকি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলার মানুষ বরাবরই যৌক্তিক মানসিকতা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে– যার ভিত্তি মূলত নিজেদের বৈষয়িক লাভ ও ক্ষতি। যদিও বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব প্রধানত কলকাতা কেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের তবুও আমরা আজ অবধি বাংলা ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম বাংলায় কোনো আন্দোলন হতে দেখি নি। রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে হিন্দি এবং জাতীয় জীবনে তার আধিপত্য স্বীকার করে নিতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় নি। ভারতব্যাপী চাকরির বাজার নিজেদের জন্য উন্মুক্ত রাখতে তারা ভাষা প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে।

বৈষয়িক স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, পাকিস্তানী রাষ্ট্রের ভৌগোলিক গঠন ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী বাংলাদেশ রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে তেমন কোনো শ্রম-চালান ছিল না বলেই ক্রমান্বয়ে 'দুই অর্থনীতি' তত্ত্বের যাথার্থতা গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। এবং পরে দুই সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবে কোনো ধারণাকে আরো জোরদার করে কোনো সমাজে অনেক ব্যক্তি যদি এক যোগে একই রকমভাবে আবেগ তাড়িত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয় তবে অবশেষে তা সামষ্টিক উপযোগিতা সৃষ্টি করে। এইভাবেই বাংলাদেশীদের মধ্যে ভাষাকে কেন্দ্র করে যে আবেগের বন্যা বয়েছিল তা আবেগময়তার স্তর থেকে যৌক্তিক রাষ্ট্রীয় দাবিতে পর্যবসিত হয়েছিল।

ভূমি প্রশ্ন

আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় বাংলাদেশের মানুষকে পশ্চিম বাংলার জনগণ থেকে বিভক্ত করে রেখেছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার সিংহভাগই গ্রামীণ চাষী। ব্রিটিশ রাজত্বের সময় তারা হিন্দু জোতদার এবং জমিদারদের হাতে অনেক নিগৃহীত হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের সময় এই জোতদার-জমিদার শ্রেণীর লোকেরা ব্যাপকহারে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতে পাড়ি জমায়। জোতদার জমিদারদের চলে যাওয়ার ফলে এই বাংলার মুসলমান চাষীদের এক বিরাট অংশ যথাযথ বিনিময়ের মাধ্যমে অথবা বেআইনি দখলের মাধ্যমে ফেলে যাওয়া জমির মালিক হয়। পশ্চিম বাংলায় চলে যাওয়া এই সব হিন্দুর মধ্যে হারানো জমি ফিরে পাওয়ার ইচ্ছা এবং ফেলে যাওয়া দশ পুরুষের ভিটে-মাটির জন্য তাদের প্রবল স্মৃতি

www.nagorikpathagar.org

তাড়না কাজ করা খুবই স্বাভাবিক, যদিও ইতোমধ্যে এদের প্রত্যেকেরই শিকড় সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম বাংলায় প্রোথিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের চাষীগণ, যারা হিন্দু জোতদার জমিদারদের প্রস্থানের ফলে লাভবান হয়েছে তারা কোনোভাবেই সেই সব 'বাবু'দের ফিরে আসা এবং তাদের থেকে জমি-জমা ফেরত নিয়ে নেওয়া মেনে নিতে পারবে না।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন এসব হিন্দু বাবুদের অনেকেই তাদের এক সময়ের পৈতৃক ভিটে-মাটি দেখতে আসে, তখন মুসলমান গ্রামবাসীদের অনেকের মনেই নানারকম সন্দেহ জেগে ওঠে। এই সন্দেহ সে সময় খুব একটা অমূলকও ছিল না যেহেতু ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বহুসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য তখনো বাংলাদেশ ছেড়ে যাচ্ছিল না। জমি কেন্দ্রিক এই প্রশ্ন পশ্চিমবাংলায় চলে যাওয়া অভিবাসী এবং বাংলাদেশের মুসলমান চাষীদের মধ্যে বরাবরই একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ইস্যু হিসেবে বিরাজ করবে। পরিতাপের বিষয় এ পর্যন্ত এই বিষয়টি আমাদের সমাজবিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকগণ তেমনভাবে পরীক্ষা করে দেখেন নি। বিষয়টির গুরুত্ব এবং বিস্ফোরনুখ প্রকৃতি একমাত্র তখনই সামনে চলে আসে যখন ১৯৭১ এর মতো ঘটনা ঘটে। এটাও প্রণিধানযোগ্য যে, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত মুজিব সরকারসহ কোনো সরকারই অর্পিত সম্পত্তির বিষয়টি হিন্দু সম্প্রদায়ের সন্তুষ্টি অনুযায়ী সুরাহা করতে পারে নি। সরকারসমূহের এই অপরাগতাই মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের জমির ওপর দখলিস্বত্বের দাবির বিস্ফোরনুখ প্রকৃতি তুলে ধরে। ১৯৪৭ এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এক অদৃশ্য ভূমি সংস্কার সংঘটন করে যা এখন উল্টে দিলে, তা যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন, একটি গৃহযুদ্ধের জন্ম দেবে। তাই কষ্ট কল্পনায়ও দুই বাংলার একত্রীকরণ অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। এমনকি যদি পশ্চিম বাংলা নিজেই কোনোদিন ভারতীয় কাঠামোর বাইরে চলে আসে তবুও দুই বাংলার একত্রীকরণ অসম্ভবই থেকে যাবে। এ কারণেই পশ্চিম বাংলার বামপন্থী নেতা জ্যোতিবসু বলেছেন, এমনকি আগামী পাঁচ শ বছরেও দুই বাংলা এক হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। এরশাদ শাসন আমলে একবার জ্যোতি বসু স্মৃতি তাড়িত হয়ে বাংলাদেশে তার বাপ-দাদার ভিটে মাটি দেখতে এসেছিলেন। বাংলাদেশে সরকার তাকে যথেষ্ট আপ্যায়নও করেছিল। তিনি বাংলাদেশের জনগণের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে কখনো এ রকম কোনো মন্তব্য করেন নি যে, দুই বাংলার মধ্যে কোনো মিল রয়েছে, যদিও এ ধরনের সফরে এসে রাষ্ট্র নেতাদের কূটনৈতিক ভাষায় দুইদেশের অভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কথা বলার রেওয়াজ রয়েছে।

বাংলাদেশী মানুসের একটি কৌতূহলোদ্দীপক দিক হল জাতিসত্তার সন্ধানে তার পেন্ডুলামের মতো দোল খাওয়া। এই দোল খাওয়া চলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক— এই

www.nagorikpathagar.org

দ্বিমুখী ঐতিহ্যের মধ্যে। একদিকে রয়েছে সংস্কৃত-ভারতীয় (মূলত পশ্চিমবঙ্গীয় সাংস্কৃতিক) উপাদানসমূহে গঠিত এবং অন্যদিকে রয়েছে এমন এক ঐতিহ্য যাকে সাধারণভাবে বলা যায় ইসলামি। ড. ডেনিস ওয়াকার লিখছেন, 'প্রায় সিকি শতাব্দী ধরে পাকিস্তানের সাথে রাজনৈতিক বন্ধনের সময় পূর্ব-পাকিস্তানি অভিজাত শ্রেণী পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্য প্রতিরোধের জন্য সংস্কৃত-ভারতীয়, বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক উপাদানসূহের আশ্রয় নিয়েছে। 'পূর্বপাকিস্তানি' ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী মুখর বুদ্ধিজীবী হিসেবে যারা পরিচিত ছিলেন তারা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে সরাসরি পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতির অংশ হিসেবে দেখেছেন। এ ব্যাপারে তারা এক দিকে এই সংস্কৃতির হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সংস্কৃতির মধ্যে মুসলিম লেখকদের রচিত উপাদানসমূহকে আমল দেন নি। তারা এই দুই পরস্পর বিরোধী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহের অমোচনীয় পার্থক্যকেও উপেক্ষা করতে চেয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গীয় উচ্চমানের সাহিত্য কর্ম পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাথে পূর্ব পাকিস্তানের যে ভিন্নতা তাকে আরো তীব্র তীক্ষ্ণ করে তুলেছে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধকে উজ্জীবিত করেছে।' (হলিডে, ডিসেম্বর ৩, ১৯৯৩)

পক্ষান্তরে আবুল মনসুর আহমদের নিজের লেখাতেই জোরালো যুক্তি রয়েছে যে, আওয়ামী ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এবং কথিত পশ্চিম বঙ্গীয় সংস্কৃতির মধ্যে সাযুজ্য সত্ত্বেও মুসলিম বাংলাদেশ সত্ত্বা এত সহজে ভারতীয় সংস্কৃতি মধ্যে অন্তর্লীন হবে না। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুথানের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবী এবং যুবশক্তির জাগরণ ঘটে তখনই আবুল মনসুর আহমদ নিজে '৬৯এর ঈদ সংখ্যা দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় 'আমাদের কৃষ্টির পটভূমি' নামে একাট নিবন্ধ লেখেন। যদিও আবুল মনসুর আহমদ তার লেখায় হিন্দু– সংস্কৃত ধারার কৃষ্টির সাথে বাংলাদেশের মানুষের কৃষ্টির অনেক মিল তুলে ধরেন কিন্তু তিনি হিন্দু সংস্কৃত কৃষ্টির সাথে এই জনগোষ্ঠির (পাক বাংলার) কৃষ্টির দূরত্ব তুলে ধরেন-- (ওয়াকার, প্রাগুপ্ত)। এভাবে জাতীয় পরিচয় সন্ধানে এক ধরনের দোলাচল বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিব যখন পাকিস্তানি বন্দিদশা থেকে বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসেন, জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন দিকসমূহ তখন ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম জনসভায় শেখ মুজিব নিজেকে একইসাথে একজন বাঙালি এবং একজন মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেন। সেই সভাতেই তিনি বাংলাদেশকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি নতুন করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সংজ্ঞা দেন এবং বারবার জোর দিয়ে বলেন যে, 'ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মহীনতা নয়'। তিনি

www.nagorikpathagar.org

সুকৌশলে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের চাপ এড়িয়ে যান। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং ও আই সি কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামিক মূল্যবোধের প্রতি তার প্রতীকি মনোভঙ্গি ফুটে ওঠে তার ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী মাহফিলে অংশগ্রহণ থেকে। পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পরপরই তিনি রেডিও, টিভিতে পবিত্র কোরআন পাঠ দিয়ে অনুষ্ঠানমালা শুরুর নির্দেশ দান করেন। এতসব পদক্ষেপ গ্রহণের পরও শেখ মুজিব বাংলাদেশী জনগণের কাছে প্রমাণে ব্যর্থ হন যে তিনি ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছেন। এটার কারণ এরই মধ্যে পঁচিশ বছর মেয়াদী 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি' সম্পন্ন এবং চালু হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুজিব বাংলাদেশের মানুষের নাড়ি সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। আমাদের নিবন্ধে ব্যবহৃত পরিভাষা অনুসারে তিনি বাংলাদেশের মানুষের মানসিকতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। যে ব্যক্তি কলকাতায় ছাত্র থাকাকালে পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।, ১৯৬৬ সন থেকে 'পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত্বশাসন' আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন, তারপক্ষে আমাদের জনগণের মনস্তত্ত্ব বোঝা কঠিন হওয়া উচিত নয়। অসুস্থ কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ভারত থেকে নিয়ে আসা, তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান শেখ মুজিবের বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে স্বাধীন ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর প্রচেষ্টাই প্রমাণ করেণ। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিশ্বে বিচ্ছিন্নতার জন্যই বাংলাদেশের একটি স্বাধীন পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে মুজিবের সাফল্য খুব কম।

জিয়াউর রহমান

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলাদেশের জনগণের জাতিসত্তার পরিচয় সফলতার সঙ্গে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করে তার স্বরূপ উপস্থাপন করেন। এই জাতির স্বকীয় আচার অনুষ্ঠান, প্রথা এবং দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার, যা ক্রমাগতই শেখ মুজিব অনুধাবন এবং স্বীকার করে আসছিলেন, তা প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে এসে সঠিক অর্থ এবং দ্যোতনা লাভ করে। বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় সত্তার স্বরূপ তুলে ধরতে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' পরিভাষার ব্যবহার একটা বিষয় সুন্দরভাবে দেখিয়ে দেয় তা হল, বাস্তব জীবনে যে রাজনীতির চর্চা করা হয় তার স্পষ্ট তাত্ত্বিক রূপ তুলে ধরা সম্ভব। তিনি সম্ভাষণ এবং বিদায়ের সময় ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু প্রতীক জনপ্রিয় করে তোলেন। এসব প্রতীক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র জাতীয় পরিচয় তুলে ধরে। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত এসব ছোটখাটো কথন, যার প্রভাব আপাতভাবে খুব মামুলি মনে হলেও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ যে একটি সুনির্দিষ্ট জাতীয় পরিচয় তা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করে।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্মের গুরুত্ব জিয়া স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছিলেন। জাতীয় জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে সবিশেষ গুরুত্ব দিলেও তিনি কখনোই বাংলাদেশকে ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রে (theocratic state) পরিণত করতে চান নি। ধর্মের গুরুত্বের নামে তিনি আধুনিক জ্ঞান– বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারে বাধা দান করেন নি। তার নির্দেশে পুলিশ আনসার এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা দলে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি, নব্য তুরস্কের পিতা কামাল আতার্তুক তার দেশকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য যেসব বিপ্লবাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেনে তার সাথে তুলনীয়। একটি সূত্রমতে, একবার কিছু গোঁড়া মুসলমান নেতৃবৃন্দ বঙ্গভবনের তার সাথে দেখা করে। তার বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে তাদের অসন্তোষ জ্ঞাপন করেছিলেন। জিয়া তাদের মনোভাব শুনে বেশ উষ্মার সাথে পাল্টা প্রশ্ন করেন, সংসারে পুরুষ মানুষ যদি সবার জন্য অথবা মহিলাদের জন্য অন্ন সংস্থান করতে না পারে তবে মহিলাদেরকেই খেটে খাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উচিত নয় কি? তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্য সেইসব গোঁড়া কাঠ মোল্লা নেতারা চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। জিয়ার রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির একটা মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের মতো মুসলমান প্রধান দেশকে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা। যাই হোক, ধর্মের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের অনীহা থাকলেও এটি দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে, ধর্ম বাংলাদেশী মানসিকতা গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ধর্মপরায়ণতা ধর্মীয় উন্মাদনার জন্ম দেবে না এবং সামাজিক অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধক হবে না। এক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গীয় মানসিকতা গঠনে ধর্মের ভূমিকা এবং বাংলাদেশী মানসিকতায় ধর্মের ভূমিকা তুলনামূলক বিচার করলে এই দুই জনগোষ্ঠীর মানসিকতার ব্যবধান আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য

প্রথমে পশ্চিম বাংলার বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। এই বঙ্গের জনসংখ্যার প্রধান অংশই ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু। বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক ড. অশোক রুদ্র তাঁর 'ব্রাহ্মণ্য ভাবধারা ও আধুনিক হিন্দু মন' গ্রন্থে হিন্দু মানসিকতার ওপর গভীর আলোকপাত করেছেন। ড. অশোক রুদ্রের বিশ্লেষণের মান এতই উচ্চ পর্যায়ের যে তার বিশ্লেষণ অনুসরণ করে আমি নিজস্ব উপসংহার টানতে প্রলুব্ধ হয়েছি। ড. রুদ্রের মতে হিন্দুবাদের কোনো পরিষ্কার অর্থ নেই। তিনি মনে করেন, বর্তমান কালে ভারতীয় জনগণের মন– মানসিকতার ওপর এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। মুসলমান অংশকে বাদ দিলে ভারতবাসীর মানসিকতার একটি নির্দিষ্ট ছাঁচ আছে। এই মানসিকতা প্রাচীনকাল থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবের ধারাতে গড়ে উঠেছে। দীর্ঘ দিন ধরে ব্রাহ্মণ্যবাদ তিনটি স্তরে একই সাথে পাশাপাশি প্রচারিত হতে থাকে। এক, উচ্চপর্যায়ে দর্শন যা সমাজের ব্রাহ্মণদের জন্য নির্ধারিত, দুই, মধ্যবর্তী শ্রেণীর

www.nagorikpathagar.org

জন্য 'শাস্ত্র' এবং তিন, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণ এবং উপপুরাণ। এসব মাধ্যমে যে সব ভাবধারা এবং আদর্শ প্রচারিত হয়েছে এগুলোকে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এই ব্রাহ্মণ্য মানসিক ভাবাধারায় বর্তমানে ভারতের সব শ্রেণীর জনগণই তা শিক্ষিতই হোক, অশিক্ষিতই হোক, আধুনিকই হোক আর মার্ক্সবাসীই হোক— প্রভাবিত।

রুদ্র মনে করেন, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের মতো সাহিত্যকর্ম ভারতীয় জনগণের মানসিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। রুদ্রের মতে, হিন্দু মানসে লালিত উচ্চ নৈতিকতা এবং ব্যবহারিক জীবনে এর শৈথিল্য কোনো দুর্ঘটনা বা কাকতালীয় ব্যাপার নয়, বর্তমান সময়ের হিন্দু সমাজে নৈতিকতা বোধের যে ব্যাপক অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় এটা প্রাচীন হিন্দু মানসের অতি নৈতিকতারই এক ফসল। কতিপয় সমাজতাত্ত্বিক যদিও বলে থকেন যে, ভারতীয় সমাজের খারাপ বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্রিটিশ রাজত্বের ফল্যশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু ড. রুদ্র মনে করেন, ভারতীয় মানুষের ওপর ব্রিটিশ প্রভাবের মাত্রা সুদীর্ঘ ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবের মাত্রার তুলনায় নগণ্য।

হিন্দু সমাজে কোনো কিছু প্রাপ্তির লক্ষ্যে আজকের সাঁইবাবার প্রতি অথবা একশ বছর আগের রামকৃষ্ণের প্রতি কিংবা মহাভারতের কৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি নিবেদন তা হিন্দু জনগণের বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে। এ কারণেই একজন হিন্দু বিজ্ঞানীর মনও পরস্পরবিরোধী সত্তায় বিভক্ত হতে পারে। তার যে মন গবেষণাগারের কাজে নিয়োজত থাকে তা থেকে প্রাত্যহিক জীবনের কাজের সাথে যে মনের যোগ তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সকল সমাজই শ্রেণীবিভক্ত। কিন্তু হিন্দু সমাজের শ্রেণী বিভাজন শুচিতার ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট। সামাজিক লেনদেনও এই শুচিতার ধারণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বৈবাহিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় বর্ণ প্রথার ওপর ভিত্তি করে। এক জন্মের কর্মের ফলাফলের ওপর নির্ভর করে পরজন্মে কে কী হয়ে জন্মাবে। এই বিশ্বাস সামাজিক বৈষম্য অলঙ্ঘনীয় করে রেখেছে। প্রায়শ্চিত্তের প্রথাও হিন্দু সমাজের বৈষম্যকে আরো দুর্লঙ্ঘ্য করে দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজের মহত্ত্ব অর্জনের একটি পন্থা হল আত্মপীড়ন (আত্মবঞ্চনা)। অনশনের হাতিয়ার ব্যবহার করে গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে আত্মপীড়নের প্রথা জনপ্রিয় করে তোলেন। অনশন ধর্মঘট দাবির প্রকৃতি বা তার যৌক্তিকতার ওপর যেমন প্রতিষ্ঠিত নয়, তেমনি তা নৈতিক শক্তির ওপরও প্রতিষ্ঠিত নয়। যেহেতু অনশনের ফলে মহাত্মাজীর শরীর দুর্বল হয়ে আসছে, তার ওজন কমে যাচ্ছে এবং নাড়ির স্পন্দন থেমে যাচ্ছে তাই ব্রিটিশ সরকারের তার দাবি না মেনে কোনো উপায় নেই। ব্রাহ্মণ্যবাদে যেমন আত্মপীড়নের মাধ্যমে ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর আসন কাঁপিয়ে

www.nagorikpathagar.org

দেওয়ার রেওয়াজ চালু রয়েছে এটাও যেন অনেকটা সে রকমই। কোনো দাবির প্রতি জনগণের সমর্থন আদায় করে তা বাস্তবায়নের পরিবর্তে অনশনের মতো রাজনৈতিক হাতিয়ার ব্যবহারের চেয়ে আর গণতান্ত্রিক পন্থা কি-ই বা হতে পারে।

ব্রাহ্মণ্যবাদ সর্বোচ্চ মঙ্গল লাভের জন্যও একটি সংক্ষিপ্ত উপায় উদ্ভাবন করেছে। তা হল দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে প্রাণী বলিদান। অবশ্য মনুষ্য বলিদানই সবচাইতে শ্রেয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আবেগিক তাড়নার অনেকটাই এসেছে এরকম ত্যাগ এবং ভক্তির প্রথা থেকে।

ভারতের সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তাবাদীরা যারা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' শ্লোগানে উদ্দীপিত ছিল, তারা ভারতকে দেবী মা-দুর্গা এবং মা কালী রূপে দেখত। একটি সূত্রমতে, এই বিপ্লববাদীদের প্রথমে শক্তি এবং ধ্বংসের দেবীর কাছে নিজেদের উ ৎসর্গ করে শপথ নিতে হত। এই দেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের বলিদান করা চাই এবং তখন ব্রিটিশ রাজ কর্মচারীরাই ছিল তাদের উদ্দেশ্যের জন্য সর্বোত্তম বলি। এই বলিদান প্রথা সুভাষ বসু থেকে নকশাল নেতা চারু মজুমদার পর্যন্ত চলে এসেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদে যে তান্ত্রিক প্রথা রয়েছে তা থেকে রক্তের বদলে রক্তের রাজনীতির সূত্রপাত ঘটেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদ ভিন্ন বর্ণ এবং ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক এবং ধর্মীয় আচরণও নির্ধারণ করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে 'আশ্রম-ভিত্তিক' জীবনধারার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। এইভাবে তাদের মধ্যে গার্হস্থ্য ধর্ম ও সন্ন্যাস ধর্মের প্রচলন ঘটে। এই সমস্ত নিয়মকানুন এবং আচার প্রথার প্রচলন করা হয় উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উৎপাদিত ফসল এবং দ্রব্যাদি শোষণের জন্য। আর 'নারী ধর্মের' প্রবর্তন করা হয় নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের জন্য ধর্মাচরণের এই বিভাজন আসলে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ধরনের শোষণ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করে রাখার জন্যেই চালু করা হয়েছিল। মূলকথা, ড. রুদ্র যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, প্রচলিত অর্থে সামন্তবাদ বলতে যা বোঝায় ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে তা প্রয়োজ্য নয়। তার মতে, যে সব ঐতিহাসিক ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতা দিয়ে ভারতীয় সমাজকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন তারা এই সমাজের স্বরূপ সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পেরেছেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদ ভালো কি মন্দ এরকম কোনো মূল্য বিচারে না গিয়ে এটা বলা যায় যে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের সঙ্গে ভারতীয় সমাজের তুলনা করতে গিয়ে যে কোনো সমাজতাত্ত্বিক এই সামাজিক দিকটিকে যথাযথ গুরুত্ব দেবেন। আর এখানে এটা বলা যায় যে ব্রাহ্মণ্যবাদ পশ্চিম বাংলার জনগণের মানসে ভারতীয়তার জন্ম দিয়েছে যা কোনো দিনই বাংলাদেশী মানসিকতার সাথে কোনো বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রণোদিত করবে না।

www.pathagar.com

ইসলামের প্রভাব

বাংলাদেশের জনগণের প্রধান অংশই মুসলমান। বাংলাদেশী মানসিকতা সঠিকভাবে বোঝার জন্য এ দেশে মুসলমানদের উদ্ভব কীভাবে ঘটে তা জানা একান্ত অপরিহার্য।

বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব এবং প্রসারের ওপর চারটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে একটি হল অভিবাসন তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে বাইরে থেকে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ভারতের অভ্যন্তরে এসে বসবাস শুরু করে। যদিও বাংলাদেশে অভিবাসী মুসলমানদের আবাসন এদেশে ইসলামের প্রসারে সহায়তা করেছে কিন্তু এই তত্ত্ব এত বিশাল মাত্রার ইসলামায়ন ব্যাখ্যা করতে পারে।

ইসলাম প্রচারের সবচাইতে প্রাচীন তত্ত্ব হল 'তরবারি তত্ত্ব'। এই তত্ত্বও গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু (জেমস ওয়াইজের ভাষায়) ১৮৭২ সনের জনসংখ্যা জরিপে দেখা যায়, মুসলমানদের বসবাস পুরোনো রাজধানীসমূহের কাছাকাছি বা আশপাশে না হয়ে বরং প্রধানত সমতল বদ্বীপ অঞ্চলে ছড়ানো। যদি তরবারি তত্ত্ব সঠিক হয় তবে মুসলমানদের বসবাস পুরোনো রাজধানীসমূহের কাছাকাছি হত, কারণ মুসলমানদের তরবারির শক্তি সবচাইতে বেশি ছিল এসব এলাকাতেই। ১৯০১ সনের জনসংখ্যা জরিপের ফলাফলের ওপর মন্তব্য তরবারি তত্ত্বকে আরো দুর্বল করে দেয়। এই জরিপে বলা হয়, এইসব (পূর্বাঞ্চলীয়) জেলাসমূহের মধ্যে মুসলমান শাসক বর্গের কোনো রাজধানীই অবস্থিত ছিল না। ঢাকা যদিও প্রায় একশ বছর ধরে নওয়াবের বাসভূমি তবু এই শহরে আশপাশের জেলাসমূহের তুলনায় অল্প সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী রয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু ফরিদপুর। মালদা এবং মুর্শিদাবাদেও পুরোনো রাজধানী ছিল। এই দু জায়গায় প্রায় সাড়ে চার শত বছর মুসলমান শাসন চালু ছিল । অথচ নিকটবর্তী দিনাজপুর, রাজশাহী, ও নদীয়া জেলাসমূহের তুলনায় এখানে মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত কম ছিল। তৃতীয় তত্ত্বটি হল, ইসলাম ছিল পৃষ্ঠপোষকতার ধর্ম। এরকম একটি অভিমত চালু আছে যে, প্রাক্-আধুনিক যুগে ভারতীয়রা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কিছু কিছু সুবিধা যেমন কর- রেয়াত, প্রশাসনে পদোন্নতি ইত্যাদি পাওয়ার জন্য। যদিও পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ এই তত্ত্বকে সমর্থন করেন, কিন্তু তা পাঞ্জাব এবং বাংলার মতো রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকায় ইসলামের ব্যাপক প্রসারকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

চতুর্থ তত্ত্বটি হল, ইসলাম সামাজিক মুক্তির সনদ। এই তত্ত্ব অনুসারে যেহেতু ইসলাম সমাজে সকলের জন্য সাম্য বিধান করে তাই নিম্ন বর্ণের হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের যাঁতাকল থেকে মুক্তির জন্য গণহারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। গবেষক রিচার্ড এম ইটন অবশ্য এই তত্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তার সাম্প্রতিক গ্রন্থ The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204— 1760 (University of California Press. Barkelay. 1993) এ বলেন, এটা হল বর্তমান যুগের

www.pathagar.com

মূল্যবোধ অতীতের মানুষের ওপর আরোপ করা। তিনি আরো যুক্তি প্রদর্শন করেন যে প্রাক্-আধুনিক মুসলমান পণ্ডিতগণ তাদের ধর্মের সামাজিক সাম্যের ওপর জোর দেন নি; বরং তারা হিন্দু ধর্মের বহু ঈশ্বরবাদের বিপরীতে ইসলামের একেশ্বরবাদের ওপর জোর দেন। তার মতে, বাংলার মানুষ যখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় তখনো সেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের তেমন প্রসার ঘটে নি। এমনকি তখন সেখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও বেশি ছিল না। বাংলায় তখন রাজবংশী, পোদ, চণ্ডাল, কোচ এবং অন্যান্য স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকজন ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে।

রাজনৈতিক ঐক্য কি সম্ভব?

তাই দেখা যাচ্ছে, বৃহত্তর (দুই) বাংলার মুসলমান প্রধান অংশের সাথে বাকি অংশের যে প্রভেদ তা হল ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মানুষের মনের ওপর এমন ছাপ রাখে যে তা মুছে ফেলা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এ ছাড়া ব্রাহ্মণ্যবাদে সামাজিক এবং ধর্মীয় আচর-আচারণ, রীতি-প্রথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং দুটোর সমন্বয়ে একটি একক জীবনবিশ্বাস বা বোধ তৈরি হয়। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে বাংলাদেশের জনগণের মানসিকতা এবং পশ্চিম বাংলার মানুষের মানসিকতা সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায় গড়ে উঠেছে। আর তাই দুই বাংলার রাজনৈতিক ঐক্যের প্রশ্ন অবান্তর যদিও দুই জনগোষ্ঠীই বাংলা ভাষায় কথা বলে।

পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত বিনয় ঘোষ কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজাফফর আহমদের ওপর লিখতে গিয়ে লেখেন ঃ আমি লক্ষ করছি এবং আজ বলতে আমার সঙ্কোচ নেই, রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে মুসলমান বন্ধুরা আন্তরিকতায়, অকৃত্রিমতায়, সততায় ও নিষ্ঠায় হিন্দু বন্ধুদের তুলনায় অনেক বেশি আকর্ষণীয়, অন্তত আমার কাছে মনে হয়েছে। তার কারণ আমার মনে হয় বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্তের চরিত্র (যারা শুধু ন্যাশনালিস্ট আন্দোলন নয়, কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও প্রবর্তক ও পরিচালক) ঐতিহাসিক কারণে (বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কৃপা করুণা পুষ্ট) এমন ঘুণধরা ও জঘন্য যে, মানসিক গুণ তাদের ভিতর থেকে প্রায় অন্তর্হিত (মাজহারুল ইসলাম সম্পাদিত মুজাফফর আহমদ; সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, পৃ ১৭২, নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৯)।

এসব বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে আমরা উপসংহার টানতে পারি যে, বাংলাদেশের জনগণের মানসিকতা ও পশ্চিম বাংলার জনগণের মানসিকতা স্পষ্টরূপে ভিন্ন। আর এ কারণে দুই বাংলার রাজনৈতিক একীকরণ অসম্ভব। বাংলাদেশ তার আলাদা জাতীয় পরিচয় নির্মাণ করেছে ভাষা আন্দোলন, ১৯৪৭ এর ভারত বিভাগের ঘটনা, ধর্ম, এর জনগণের সুনির্দিষ্ট জাতিগত বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি উপাদান সহযোগে। এগুলো সব একসঙ্গে মিলে বাংলাদেশের জনগণকে একটা সুনির্দিষ্ট আলাদা মানসিকতা দান করেছে। বাংলাদেশী মানসিকতার ওপর আরো গভীর গবেষণা এবং তার স্বরূপ আরো পরিষ্কারভাবে নিরূপণ করতে পারলে আমাদের জাতিগঠনের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পারিবারিক গ্রন্থাগার
www.pathagar.com